শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী [দা. বা.]

ইসলাহী খুতুবাত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ উমায়ের কোব্বাদী
উস্তাযুল হাদীস ওয়াত্‌তাফসীর মাদরাসা দারুর রাশাদ
মিরপুর, ঢাকা।
খতীব বাইতুল ফালাহ্ জামে মসজিদ
মধ্যমণিপুর, মিরপুর ঢাকা।

দারুল উলুম লাইব্রেরী
[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আপনার সংগ্রহে রাখার মতো আমাদের আরো কয়েকটি গ্রন্থ

- ইসলাহী খুতুবাত [১-৬]
- আধুনিক যুগে ইসলাম
- আত্মার ব্যাধি ও তার প্রতিকার [১ম ও ২য় খণ্ড]
- সাম্রাজ্যবাদীর আগ্রাসন : প্রতিরোধ ও প্রতিকার
- সামাজিক সংকট নিরসনে ইসলাম
- হীলা-বাহানা শয়তানের ফাঁদ
- নারী স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতা
- রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে দুনিয়ার হাকীকত
- দারুল উলূম দেওবন্দ-উলামায়ে দেওবন্দ কর্ম ও অবদান
- প্রযুক্তির বিনোদন ও ইসলাম
- স্বপ্নের তারকা [সিরিজ ১, ২, ৩]
- আর্তনাদ [সিরিজ ১, ২]
- সুলতান গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী
- অনন্য নামের সমাহার [সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ সহস্রাধিক নামের একটি সংকলন]

সূচিপত্র

তাওবা : সকল গুনাহর প্রতিষেধক

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রসঙ্গ : মাপে কম দেয়া এবং অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন করা

ভাই-ভাই হয়ে যাও

রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার আদব

সালামের আদব

মুসাফাহার আদব

ছয়টি সোনালী উপদেশ

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থান কোথায়?

"যদি আমাদের মাঝে গুনাহর প্রতি আকর্ষণ না থাকে, তাহলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? গুনাহর প্রবণতা এবং গুনাহ-বিরোধী শক্তি যদি বিরোধে জড়াতে না পারে, তাহলে আমাদের সাফল্য বুঝা যাবে কী করে? নফসের সঙ্গে মোকাবেলা না হলে, শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ না বাঁধলে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের প্রতিভা ও ক্ষমতা দেখাতে না পারলে, তবে কীসের পুরস্কারস্বরূপ আমরা জান্নাত পাবো? অন্তরে গুনাহর তাড়না দাপাদাপি করবে, কিন্তু মানুষ আল্লাহর বড়ত্ব ও ভয়ের মাধ্যমে তার মোকাবেলা করবে এবং বিজয়ী হবে- মানুষ তখনই তো পরিপূর্ণ মানুষ হবে।"

তাওবা : সকল গুনাহর প্রতিষেধক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

হামদ ও সালাতের পর

প্রিয়নবী (সা.)-এর প্রতিদিনের ইসতেগফার ছিলো কমপক্ষে একশ' বার–

وَعَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّهٗ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِيْ حَتّٰى اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

(صحيح مسلم، كتاب الذكر، رقم الحديث ٢٧٠٢)

'হযরত আগার আলমুযানী (রা.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মাঝে মাঝে আমার অন্তর মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়, এমনকি প্রতিদিন আমি একশ' বার পর্যন্ত ইসতেগফার করি।'

কথাটি কে বলেছেন? সেই মহান ব্যক্তিত্ব বলেছেন, যিনি ছিলেন নিষ্পাপ, পবিত্র, গুনাহ করার কল্পনা থেকেও যিনি ছিলেন মুক্ত। ভুল-চুকের সঙ্গে যার জীবন পরিচিত নয়। কারণ, তার সকল ভুল-চুক সব সময়ের জন্যই ক্ষমাপ্রাপ্ত। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

لِيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

'যেন আল্লাহ আপনার আগে-পিছের সকল ভুল-চুক মাফ করে দেন।'
(সূরা আল-ফাতহ : ২)

এমন মার্জিত, পরিশীলিত জীবন যাঁর, তাঁর বক্তব্য শুনুন– 'আমি প্রতিদিন একশ' বার ইসতেগফার করি, আল্লাহর দরবারে গুনাহ মাফ চাই।'

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম বলেছেন, 'একশ' সংখ্যাটি সংখ্যা হিসেবে তিনি বলেননি। কারণ, তাঁর ইসতেগফার ছিলো আরো অনেক বেশি।

মনে গুনাহর অসঅসা সকলেরই জাগে

যে নবী (সা.) হৃদয়-প্রাচুর্যের অধিকারী ছিলেন, তিনি কেন এত বেশি ইসতেগফার করেন? উলামায়ে কেরাম এরও বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে যে, আসলে হাদীসে উল্লিখিত 'কখনও কখনও আমার অন্তর মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়'- এর অর্থ হলো, মানবিক কারণে একজন নবীর অন্তরেও কখনও কখনও অসঅসা সৃষ্টি হতে পারে। মানুষ যত বড় মুত্তাকীই হোক না কেন, তার অন্তরেও গুনাহর তাড়না হিসহিস করে ওঠতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাকাম তো সকল মাখলুকের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি, যে মাকাম পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি-সামর্থ্য কারো নেই। এমন অফুরন্ত মর্যাদার অধিকারী হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এছাড়া যত ওলি, বুযুর্গ, সুফী এ পৃথিবীর বুকে ছিলেন, প্রত্যেকেই গুনাহর এ তপ্ত মানবিক ছোঁয়া টের পেয়েছেন। মনের জগতে গুনাহ করার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেকের অন্তরেই জেগেছে। তবুও তাঁরা ছিলেন আলোকিত মানুষ। কারণ, তাঁরা আল্লাহর ফযলে এবং মুজাহাদার বরকতে এসব গুনাহ থেকে নিজেদেরকে সযত্নে দূরে রেখেছেন। শয়তানের অসঅসা এবং নফসের আকুলিবিকুলি সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন সতেজ ও সচেতন। আর আমাদের অবস্থা? আমাদের অবস্থা হলো সম্পূর্ণ এর বিপরীত। অসঅসার চতুরতা আমাদেরকে কাত করে ফেলে। অসঅসা আসতে দেরী, গুনাহ করতে আমাদের দেরী হয় না। হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا

অর্থাৎ- যুলায়খা ইউসুফ (আ.)-এর সামনে গুনাহকে চোখ ধাঁধিয়ে মেলে ধরেছে, আর ইউসুফ (আ.)ও তখন কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে এ গুনাহ থেকে রক্ষা করে দিয়েছেন।'

বুঝা গেলো, গুনাহর অসঅসা আসা দূষণীয় নয়। তবে অসঅসার ডাকে সাড়া দেয়া অবশ্যই অন্যায়।

এ ধারণা ভুল

অতএব, তাসাওউফ বা তরীকতের পথে আসার পর এটা ভাববে না যে, এ পথে এলে গুনাহ করার মানসিকতা একেবারে মিটে যায়। বরং তাসাওউফ, মুজাহাদা ও অনুশীলনের কাজ হলো, গুনাহ-প্রত্যাশী নফসকে একটু একটু করে নিস্তেজ করে আনা, যাতে তার মোকাবেলা করা সহজ হয়ে যায়। এটাই তাসাওউফের সফলতা। তাসাওউফ গুনাহর মানসিকতাকে মিটিয়ে দিতে পারে না, বরং নিস্তেজ করে দিতে পারে।

যৌবনকালে তাওবা করো

গুনাহর বাসনা অন্তরে জাগতে পারে, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে–

فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا

অর্থাৎ– 'আমি মানুষের অন্তরে গুনাহ্‌র কাজ এবং নেককাজ উভয়টারই কামনা সৃষ্টি করি।'

এটাই আমাদের পরীক্ষা। যদি আমাদের মাঝে গুনাহর প্রতি আকর্ষণ না থাকে, তাহলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়? গুনাহের প্রবণতা এবং গুনাহ-বিরোধী শক্তি যদি বিরোধে জড়াতে না পারে, তাহলে আমাদের সাফল্য বুঝা যাবে কী করে? নফসের সঙ্গে মোকাবেলা না হলে, শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ না বাঁধলে এবং এ যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের প্রতিভা ও ক্ষমতা দেখাতে না পারলে, তবে কিসের পুরস্কারস্বরূপ আমরা জান্নাত পাবো? অন্তরে গুনাহর তাড়না দাপাদাপি করবে, কিন্তু মানুষ আল্লাহর বড়ত্ব ও ভয়ের মাধ্যমে তার মোকাবেলা করবে এবং বিজয়ী হবে– মানুষ তখনই তো পরিপূর্ণ মানুষ হবে। এজন্য শেখ সাদী (রহ.) বলেছেন–

وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیز گار

در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری

অর্থাৎ– বুড়ো বয়সে তো হিংস্র বাঘও তাকওয়ার খোলস পরে। নিজের দুরন্তপনা, শক্তিমত্তা হারালে হিংস্রতা আর করবে কীভাবে? তখন পরহেযগার সাজা ছাড়া তার উপায়ইবা কী? তাই বুড়ো বয়সে এসে যালিম বাঘও পরহেযগার সাজে।

অপরদিকে যে যুবকটির জীবন অফুরন্ত খেলাধুলা, উদ্দাম ফুর্তি আর অবাধ স্বাধীনতায় থৈ থৈ করে, সে যুবকটি যদি তাওবা করে, তাহলে একেই বলে প্রকৃত তাওবা। আম্বিয়ায়ে কেরামের তাওবার স্বরূপ ছিলো এমনই। তাঁরা যৌবনকালে অধিক তাওবা করতেন।

আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শের প্রভাব

কেউ কেউ মনে করে, কোনো আল্লাহওয়ালা তার প্রতি বিশেষ নজর দিলে, আলিঙ্গন করে নিলে, ওই আল্লাহওয়ালার বুক থেকে স্নিগ্ধঝরা এক অপার্থিব নূর তার বুকে প্রবেশ করবে। ফলে গুনাহ করার ইচ্ছা তার মন থেকে মুছে যাবে। মনে রাখবেন, এটা কখনও হবে না। যে ব্যক্তি এ জাতীয় ধারণা নিয়ে বসে

আছে, সে ধোঁকায় পড়ে আছে। এমনটি হলে তো দুনিয়াতে কাফির বলতে কোনো প্রাণীর অস্তিত্বই থাকতো না, আল্লাহওয়ালারা এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ঈমানের নূর দ্বারা সকলকেই আলোকিত করে দিতেন।

একবার হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর দরবারে এক লোক এসে বললো, হযরত! আমাকে কিছু নসীহত করুন। হযরত থানভী (রহ.) তাকে কিছু নসীহত করে দিলেন। চলে যাওয়ার সময় ওই লোক বলে ওঠলো, হযরত! আপনার সীনা থেকে আমাকে কিছু দান করুন। এ কথা দ্বারা লোকটির উদ্দেশ্য ছিলো, হযরত থানভী (রহ.) নূরের কোনো বিচ্ছুরণ তার সীনাতে ঢুকিয়ে দেন, যার ফলে সে বেড়া পার হয়ে যাবে এবং গুনাহ করার খাহেশ তার অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে। হযরত থানভী উত্তর দিলেন, আমার সীনা থেকে তোমাকে কী দিবো? আমার সীনাতে কফ-থুতু জমাট বেঁধে আছে, চাইলে নিতে পার।

আসলে বুযুর্গদের সম্পর্কে এ জাতীয় ধারণা করা ভুল।

ایں خیال است ومحال است وجنون

'এটা নিছক কল্পনা, অসম্ভব ধারণা, পাগলামিপূর্ণ চেতনা।'

হ্যাঁ, আল্লাহওয়ালাদের সংস্পর্শের একটা মূল্য অবশ্যই আছে। এর ফলে মানুষের মন-মানসের পরিবর্তন ঘটে। মানুষ তখন সঠিক পথে চলতে সক্ষম হয়। চিন্তা-চেতনার মাঝে বিপ্লব সৃষ্টি হয়। তবে কাজ করতে হয় নিজেকে, বুযুর্গদের কাজ হলো শুধু সংস্পর্শ দেয়া।

নফসের পাহারাদার সব সময় প্রয়োজন

আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের প্রভাবে মানুষ প্রভাবিত হয়, মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে, পরিশীলিত জীবনের অধিকারী সে হয়– এসব কিছু অবশ্যই আল্লাহওয়ালাদের সোহবতের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো আল্লাহওয়ালার কাছ থেকে এসব গুণ অর্জন করে ফেলে এবং তাকওয়া, তাহারত, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের সম্পদ কারো যদি অর্জন হয়ে যায়, তারপর খেলাফতের মর্যাদাও লাভ করে, তাহলে তার জন্যও প্রয়োজন নফসের পাহারাদারি করা। একজন কামিল পীরও শয়তানের ধোঁকা ও নফসের ছল-চাতুরি থেকে অসতর্ক থাকতে পারে না, থাকা উচিতও নয়। এজন্যই কবি বলেছেন–

اندریں رہ می تراش ومی خراش

تادم آخر دمے فارغ مباش

অর্থাৎ– এপথে সাজগোজ, হম্বিতম্বি সব সময়ের জন্যই। এমনটি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তোমাকে থাকতে হবে অত্যন্ত সতর্ক। কেননা, এ নফস যেকোনো সময় তোমাকে জালে জড়িয়ে ফেলতে পারে।

এক কাঠুরিয়ার ঘটনা

মনসবী শরীফে মাওলানা রুমী (রহ.) ঘটনাটি লিখেছেন। এক কাঠুরিয়ার ঘটনা। প্রতিদিন সে জঙ্গলে যেতো, লাকড়ি জোগাড় করতো, তারপর বাজারে বিক্রি করে দিতো, এভাবেই তার পরিবার চলতো। প্রতিদিনের মতো আজও সে জঙ্গলে গেলো। লাকড়ি কুড়িয়ে আঁটি বেধে বাড়িতে নিয়ে এলো। এরই মধ্যে ঘটে গেলো এক ভয়াবহ ঘটনা। লাকড়ির আঁটির ভেতরে চলে এলো একটি বিষধর সাপ। তবে জীবিত নয়, মনে হয় মৃত। কাঠুরিয়া ভাবলো, মরা সাপ আর কীইবা করতে পারবে, তাই সে এর প্রতি বিশেষ মনোযোগী হলো না। রাতে সে ঘুমিয়ে পড়লো। অপরদিকে সাপটি তো আসলে মৃত ছিলো না, বরং জীবিতই ছিলো। হয়ত তার শরীরটার ওপর বিশাল ধকল গিয়েছিলো, তাই আধমরা হয়ে গিয়েছিলো। কাঠুরিয়া একেই ভেবেছিলো মৃত। এখন সাপটি দীর্ঘ বিশ্রাম পেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠলো, ধীরে ধীরে ফোঁস ফোঁস শুরু করে দিলো। এতকিছু ঘটে যাচ্ছিলো, অথচ কাঠুরিয়া ও তার পরিবার ছিলো সম্পূর্ণ বেখবর। এক পর্যায়ে সাপটি ফণা তুললো এবং কাঠুরিয়াকে দংশন করে নিজের ঠিকানায় চলে গেলো। আর কাঠুরিয়া মারা গেলো। সকাল বেলা ওঠে পরিবারের সকলেই তো হতবাক, কী থেকে কী হয়ে গেলো! একটি মরা সাপ কিভাবে একজন জলজ্যান্ত লোককে এভাবে মেরে ফেললো!

নফসও একটি বিষধর সাপ

উক্ত বর্ণনা করার পর মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন, মানুষের নফসও একটি বিষধর সাপের মতো। মানুষ যখন আল্লাহওয়ালার সোহবতে থাকে, রিয়াযত-মুজাহাদা করে, তখন নফস কিছু সময়ের জন্য হয়ত নিস্তেজ হয়ে পড়ে, কিন্তু মরে তো যায় না। সময় মতো সে আবার জেগে ওঠতে পারে, ফণা তুলতে পারে এবং বিষ ঢেলে দিতে পারে। সুতরাং তাকে মৃত ভাবার কোনো কারণ নেই। মাওলানা রুমীর ভাষায়–

نفس اژدہاست مردہ است

از غمِ بے آلتی افسردہ است

অর্থাৎ– মানুষের নফসও ওই বিষাক্ত সাপের মতো, এখনও যার মৃত্যু হয়নি। রিয়াযত, মুজাহাদা ও সাধনার ঝড়ে সে হয়তো কিছুটা নেতিয়ে পড়েছে, তবে মারা যায়নি। যে-কোনো সময় সে তেজী হয়ে ওঠতে পারে, ছোবল মারতে পারে, ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অতএব, এর ধ্বংস-ক্ষমতা সম্পর্কে উদাস থাকা যাবে না মোটেও। এক মুহূর্তের অসতর্কতার সুযোগে সে ধ্বংস করে দিতে পারে অনেক কিছু।

ইসতেগফার এবং তাওবা : গুনাহগুলোর প্রতিষেধক

কিন্তু আল্লাহ বান্দার ওপর পরম দয়ালু। যেমনিভাবে তিনি নফস ও শয়তান নামক দু'টি বিষধর সাপ তৈরি করেছেন, যাদের কাজ হলো, মানুষকে পাপের সাগরে ডুবিয়ে মারা এবং জাহান্নামের অগ্নি জিহ্বার মুখে সপে দেয়া; তেমনিভাবে তিনি এদের মোকাবেলায় সৃষ্টি করেছেন শক্তিশালী প্রতিষেধক। বিষের প্রতিষেধক থাকবে না– আল্লাহর হেকমতের দাবি অনুযায়ী এমনটি হতেই পারে না। বিষের ধ্বংসশক্তি এবং প্রতিষেধকের উপশমশক্তি সমবলীয়ান করে তিনিই সৃষ্টি করতে পারেন, যিনি বান্দার ওপর এত দয়ালু হতে পারেন। বরং প্রতিষেধকটা আরো বেশি ক্ষমতাধর। আর তাহলো, ইসতেগফার এবং তাওবা। ইসতেগফার এবং তাওবা শয়তান ও নফসের পরম শত্রু। এ শত্রুকে তারা খুবই ভয় পায়। কারণ, এ শক্তি তাদের বিষকে একেবারে অকেজো করে দিতে সক্ষম। অতএব, যখনই দেখবে শয়তান ছোবল মারার জন্য হিসফিস করছে কিংবা নফস দংশন করার জন্য ফোঁসফোস করছে, তখনই তাওবা এবং ইসতেগফার নামক প্রভাব বিস্তারী প্রতিষেধক কাজে লাগাবে। সঙ্গে সঙ্গে ইসতেগফার পড়ে নিবে–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

উক্ত দু'আটি ইসতেগফারের দু'আ। শয়তান ও নফসের বিরুদ্ধে ঢালস্বরূপ একটি দু'আ। তাদের ঢেলে দেয়া বিষ নিমিষেই শেষ করে দেয়ার অত্যন্ত ফলদায়ক হাতিয়ার এটি। সুতরাং সব সময় এ হাতিয়ারকে কাজে লাগাবে।

কুদরতের আজব কারিশমা

আমি দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে গিয়েছিলাম। সফরটি করেছিলাম রেলযোগে। পথে এক জায়গায় রেল থামলো। এলাকাটি ছিলো পাহাড়ি। আমরা নামাযের উদ্দেশ্যে রেল থেকে নেমে পড়লাম। তখনি সেখানে দেখতে পেলাম সুন্দর একটি বৃক্ষচারা। চমৎকার কচি কচি তার পাতা। পাতাগুলোর সৌন্দর্য দেখে আমি দারুণভাবে মোহিত হলাম। নিজের অজান্তেই হাত বাড়ালাম একটি পাতা ছিঁড়ে নেয়ার জন্য। আর তখনই আমার রাহবার আমার হাতটা এক ঝটকায়

সরিয়ে দিয়ে উদ্বেগঝরা কণ্ঠে আমাকে বললো, 'হযরত! এখানে হাত দিবেন না।' জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' সে উত্তর দিলো, 'এই খুব বিষাক্ত গাছ। যদিও এর পাতাগুলো খুব সুন্দর, কিন্তু এর প্রতিটি পাতা বিচ্ছুর দংশনের মতোই বিষাক্ত। গায়ে লাগলে মুহূর্তের মধ্যে এর বিষ ছড়িয়ে পড়বে আপনার সারা শরীরে।' আমি বললাম, 'আল্লাহর শোকর! এখনও হাত দিইনি। এর পূর্বেই আপনি আমাকে সতর্ক করে দিলেন। তবে ব্যাপারটাতে আমি দারুণ মুগ্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচলিতও। কারণ, আমার মতো অজানা কোনো লোক তো এর সৌন্দর্য-ঝলক দেখে ধোঁকা খাবে। হয়ত এর সৌন্দর্যের টানে এগিয়ে যাবে, পাতা ছিঁড়তে চাইবে, আর তখনই তো বেচারা মুসিবতে পড়ে যাবে।'

আমার এ কথাগুলো শুনে লোকটি আমাকে যা বললো, এতে আমি আরো বেশি বিস্মিত। সে বললো, 'কুদরতের আজব কারিশমা দেখুন, যেখানেই এ গাছটি থাকে, সেখানেই কিংবা তার আশেপাশেই থাকবে আরেকটি গাছ। কেউ এর বিষে আক্রান্ত হলে ব্যবহার করবে ওই গাছটি। কারণ, এ গাছটি বিষাক্ত আর তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটি হয় এর বিষের প্রতিষেধক। ওই গাছটির পাতা আক্রান্ত জায়গায় ঘষলে এর বিষ দূর হয়ে যায়।'

এ বলে লোকটি অন্য একটি গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে বললো, 'এটাই সেই বিষ-প্রতিষেধক গাছ।'

আমাদের গুনাহ এবং ইসতিগফারের বিষয়টিও অনুরূপভাবে। এইজন্য যেখানেই গুনাহর বিষ দেখবে, সেখানেই ইসতিগফার নামক প্রতিষেধক কাজে লাগাবে। তখন দেখবে, গুনাহর বিষ ইসতিগফারের আঘাতে একেবারে মিটে যাবে।

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর প্রতিনিধিকে প্রতিষেধকের হাতিয়ার দিয়ে পাঠিয়েছেন

এজন্য হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, আল্লাহ তাআলা মানুষকে গুনাহর ক্ষমতা দান করে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে প্রতিনিধি বানিয়ে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন। তিনি যেসব সৃষ্টিজীবের মধ্যে গুনাহ করার প্রতিভা দেননি, তাদেরকে তিনি প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতাও দান করেননি। যেমন ফেরেশতা, গুনাহ করার প্রতিভা তাদের নেই। সুতরাং প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতাও তাদের নেই। আর মানুষের মধ্যে গুনাহ করার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে এবং পৃথিবীর বুকে পাঠানোর পূর্বে এর দৃষ্টান্ত পেশ করার উদ্দেশ্যে মানুষ দ্বারা একটি ভুল সংঘটিত করিয়ে এর অনুশীলনও করানো হয়েছে। মানুষের আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর কথাই বলছি। আল্লাহ তাঁকে যখন জান্নাতে পাঠিয়েছেন, তখন তাকে বলে দেয়া হয়েছিলো, জান্নাত তোমার বাড়ি। যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে, যা মনে চায় খেতে পারবে। তবে ওই যে গাছটি দেখতে পাচ্ছ, তার কাছেও ঘেঁষবে না।

তারপর শয়তান জান্নাতের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগলো এবং হযরত আদম (আ.)কে তার চতুরতার জালে আটকে ফেলতে সক্ষম হলো। ফলে আদম (আ.) নিষিদ্ধ গাছের কাছে গেলেন এবং তার একটি ফল খেয়েও ফেললেন। এভাবে প্রথম মানুষ থেকে সংঘটিত হয় প্রথম ভুল। তবে ভুলটি ঘটে যাওয়ায় তাঁর অন্তর লজ্জায় অস্থির ও উদ্বিগ্ন ওঠলো। লজ্জা, অস্থিরতা ও হৃদয়ের উত্তাপ তার বেড়েই চললো। হে আল্লাহ! কী থেকে কী হয়ে গেলো, কেমন করে সংঘটিত হয়ে গেলো এত বড় ভুল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দয়া হলো। বান্দার হৃদয়ের আহ্বানে তিনি সাড়া দিলেন। বললেন, শোনো, এ শব্দগুলো শিখে নাও এবং বার বার পড়তে থাকো–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

উক্ত শব্দগুলো আল্লাহ আদম (আ.)কে শিখিয়ে দিলেন। কুরআনের ঘোষণা মতে– 'আমি আদমকে শিখিয়ে দিলাম কয়েকটি শব্দ। দেখুন, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে এ শব্দগুলো তাঁকে না শিখিয়ে এবং বার বার বলার নির্দেশ না দিয়ে এমনিতেই ক্ষমা করে দিতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ এমনটি করেননি। কেন করেননি?

ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলেন, এটা ছিলো মূলত একটা অনুশীলন। এর মাধ্যমে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যখন পৃথিবীতে যাবে, সেখানেও প্রতিনিয়ত শিকার হবে এ ধরনের পরিস্থিতির। সেখানেও শয়তানের ধোঁকা এবং নফসের প্রতারণা-খেলা থাকবে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তোমাদের হাতে তারা করাবে। অতএব যদি এর জন্য শক্তিশালী কোনো প্রতিষেধক না নিয়ে যাও, তবে পৃথিবীর জীবনটা তোমাদের জন্য তখন সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াবে। আর সেই প্রতিষেধকটি হলো ইসতিগফার ও তাওবা। এ প্রতিষেধকটা ভালোভাবে বুঝে নাও, তারপর পৃথিবীতে যাও, সময় মতো কাজে লাগাও, এর মাধ্যমেই 'ইনশাআল্লাহ' গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

তাওবা তিনটি জিনিসের সমষ্টি

তাওবা এবং ইসতিগফার– এ দু'টি শব্দ আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। এর মধ্যে মূল হলো তাওবা। আর ইসতিগফার হচ্ছে, তাওবার দিকে যাওয়ার পথ। তিনটি জিনিসের সমষ্টিকে বলা হয়, তাওবা, যে তিনটি জিনিস পাওয়া না গেলে সেই তাওবা অসম্পূর্ণ। তিনটি জিনিস হলো যথাক্রমে–

১. কৃত গুনাহর ওপর লজ্জিত হতে হবে।

২. গুনাহটি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতে হবে।

৩. ভবিষ্যতে না করার অঙ্গীকার করতে হবে।

এ তিনটি জিনিস পাওয়া গেলে তখনই হবে পরিপূর্ণ তাওবা। আর তাওবাকারীর গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। সে পরিণত হয় এক পবিত্র ও আলোকিত মানুষে। হাদীস শরীফে এসেছে–

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (ابن ماجه، كتاب الزهد، رقم الحديث ٤٣٠٤)

অর্থাৎ– 'গুনাহ থেকে তাওবাকারী ওই ব্যক্তির মতই পবিত্র, যার কোনো গুনাহ নেই।'

এখানে তাওবা কবুল হওয়ার অর্থ শুধু এটা নয় যে, তার আমলনামায় লিখে দেয়া হবে– অমুক এই গুনাহটি করেছে, এখন তা মাফ করে দেয়া হয়েছে। বরং এর অর্থ হলো, তার আমলনামা থেকে গুনাহটি সম্পূর্ণভাবে মুছে দেয়া হয়। কিয়ামতের দিন এর আলোচনাও আর উঠবে না।

কিরামান কাতিবীন : একজন আমীর, অপরজন তার অধীন

বরং আমি আমার শায়খ থেকে একটি কথা শুনেছি, যা কোনো কিতাবে পাইনি, তাহলো প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে কিরামান কাতিবীন নামে যে দু'জন ফেরেশতা রয়েছেন, যারা মানুষের নেক কাজ আর বদআমল লিপিবদ্ধ করেন, ডান দিকের ফেরেশতা নেকগুলো লিখেন আর বাম দিকের ফেরেশতা বদগুলো লিখেন। আমার শায়খ এ দুই ফেরেশতা সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তাআলা ডান দিকের ফেরেশতাকে করেছেন বাম দিকের ফেরেশতার জন্য আমীর। কেননা, আল্লাহর বিধান তো হলো, দু'জন এক সঙ্গে কোনো কাজ করলে একজনকে আমীর মেনে নিতে হয়। এ দুই ফেরেশতার বেলায় বিধানটি প্রযোজ্য। এজন্য মানুষ যখন নেকআমল করে, ডান দিকের ফেরেশতা তা সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলে। তখন বাম দিকের ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, আমীর কোনো কাজ করলে অধীনকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়ে না। পক্ষান্তরে মানুষ যখন কোনো গুনাহ করে, তখন বাম দিকের ফেরেশতা তার আমীর তথা ডান দিকের ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করে এটি লিখবো কিনা? ডান দিকের ফেরেশতা উত্তর দেয়, 'না, এখনই লিখো না। একটু অপেক্ষা কর। এমনও হতে পারে যে, সে তাওবা করবে। এখন লিখে ফেললে তখন তো মুছে দিতে হবে।' এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বাম দিকের ফেরেশতা আবার জিজ্ঞেস করে যে, 'এবার লিখবো কিনা?' ডান দিকের ফেরেশতা এবারও একই উত্তর দেয়। এভাবে আরো কিছু সময়ের পর বাম দিকের ফেরেশতা তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করে। তখন ডান দিকের ফেরেশতা উত্তর দেয় যে, 'হ্যাঁ, এবার লিখতে পার।'

শতবার তাওবা ভেঙেছ, তবুও ফিরে এসো

আল্লাহর দয়া দেখুন যে, বান্দা গুনাহ করে ফেললে তাওবার সুযোগ দেন। যেন ওই গুনাহর কথা আমলনামা তো লেখার প্রয়োজনই না পড়ে। এরপরেও কেউ যদি তাওবা না করে, তাহলে আমলনামাতে লিখে রাখা হয়। এ লেখার পরেও মৃত্যু পর্যন্ত তাওবার দরজা খোলা থাকে যে, যখন চাও, তাওবা কর এবং আমলনামা থেকে গুনাহটি মিটিয়ে দাও। মাত্র একবারের জন্যও নির্ভেজাল তাওবা করতে পার। তবে ওই গুনাহটি তোমার আমলনামা থেকে একেবারে মুছে দেয়া হয়। মৃত্যুর গোঙানী শুরু হওয়া পর্যন্ত তাওবার দরজা-জানালা তোমার জন্য খোলা থাকে। আল্লাহু আকবার! কত বড় দয়ালু আমাদের আল্লাহ তাআলা। কবি চমৎকার বলেছেন–

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ ☆ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
ایں درگہ ما درگہ نو امیدی نیست ☆ صد بار گر توبہ شکستی باز آ

যে কোনো মানুষের জন্য এমনকি কাফির ও মূর্তিপূজারীর জন্য তাওবার দরজা উন্মুক্ত। আল্লাহর রহমত সকলকেই হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কী মনোরম ও স্নিগ্ধ সেই ডাক। যে ডাকে কোনো কৃত্রিমতা, নৈরাশ্যের কোনো ছোঁয়া নেই। শতবার তাওবা লংঘন করলেও সেই ডাকের কোনো বিরাম নেই। চলে এসো, আল্লাহর রহমতের সুমিষ্ট ছায়াতলে ফিরে এসো।

রাতে শোয়ার পূর্বে তাওবা করবে

বাবা নাজম আহসান (রহ.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ। হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা। চমৎকার মানুষ ছিলেন তিনি। যারা তাঁকে দেখেছে, তাঁর সম্পর্কে তারা খুব ভালো জানে। বিরল প্রতিভার অধিকারী, বিচক্ষণ ও দৃঢ়চেতা ছিলেন তিনি। সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন। একদিন তিনি তাওবা সম্পর্কে বয়ান করছিলেন। আমিও কাছেই ছিলাম। ছোট ছোট চুটকি মাঝে মাঝে তিনি শুনাতেন। বয়ান চলাকালীন স্বাধীনচেতা এক যুবক তাঁর কাছে এলো। যুবক তাঁর নিজের কোনো প্রয়োজনেই এসেছিলো। কিন্তু এ বুযুর্গ তো সব সময় একই ফিকিরে থাকতেন যে, কীভাবে মানুষকে দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া যায়। এজন্য ওই যুবককে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, শোনো! মানুষের ধারণা হলো, দ্বীনের ওপর চলা খুব কঠিন। আসলে দ্বীনের ওপর চলা খুব সহজ। রাতের বেলায় একটু বসে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নিবে। ব্যস, এটাই তো দ্বীন।

গুনাহর আশঙ্কা এবং গুনাহ্ না করার অঙ্গীকারের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই

যুবকটি চলে যাওয়ার পর আমি হযরতকে বললাম, 'হযরত! আসলেই বিস্ময়কর এক তাওবার সন্ধান আপনি যুবকটিকে দিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে তো খটকা দেখা দিয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী খটকা? আমি বললাম, শুনেছি, তাওবার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

১. কৃত গুনাহের ওপর অনুতপ্ত হওয়া।

২. গুনাহটি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয়া।

৩. ভবিষ্যতে না করার অঙ্গিকার করা।

এ তিনটি শর্তের মধ্যে প্রথম দুটি শর্ত পূরণ করা তো খুব কঠিন নয়। তবে সমস্যা হলো– তৃতীয় শর্তটিকে নিয়ে। কারণ, কে জানে অঙ্গীকার টেকসই হবে কিনা? আর অঙ্গীকার শুদ্ধ না হলে তাওবা তো শুদ্ধ হবে না। সুতরাং গুনাহটিও মাফ হবে কি হবে না– এ ব্যাপারে খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছি।'

আমার উক্ত কথার উত্তরে বাবা নাজম আহসান (রহ.) বললেন, যাও মিয়াঁ! তোমরা তো অঙ্গীকারের অর্থ কী, সেটাই বুঝো না। অঙ্গীকারের অর্থ হলো, নিজের পক্ষ থেকে এই নিয়ত কর যে, ভবিষ্যতে গুনাহটি আর করবো না। এখন অঙ্গীকারের সময় অন্তরে যদি এ খটকা থাকে যে, অঙ্গীকার পূর্ণ করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে কি না, তবে এটা অঙ্গীকার পরিপন্থী নয়। হ্যাঁ, নিয়তটা হতে হবে নির্ভেজাল। আর খটকার জন্যও একটা চিকিৎসা আছে। তাহলো, আল্লাহর কাছে দুআ কর যে, হে আল্লাহ! আমি তাওবা করছি। ভবিষ্যতে গুনাহটি না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। কিন্তু আমি কতটুকু, আমার ওয়াদাই বা কতটুকু? আমি নিতান্ত দুর্বল। জানা নেই, এ ওয়াদার ওপর টিকে থাকতে পারবো কিনা? হে আল্লাহ! আপনিই আমাকে ওয়াদার ওপর মজবুত ও স্থির রাখুন। এভাবে দুআ করলে ইনশাআল্লাহ উদ্ভূদ খটকা আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে।

সত্য বলতে কী, বাবা সাহেবের উক্ত কথাগুলো শুনে আমার অন্তর শান্তিতে ভরে গেলো।

নিরাশ হয়ো না

হযরত সিররী সাকতী (রহ.) ছিলেন একজন বড় মাপের আল্লাহওয়ালা। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)-এর শায়খ ছিলেন। তিনি বলতেন, গুনাহগুলোর কারণে অন্তরে ভয় থাকলে এবং এর জন্য অনুশোচনা হলে তার জন্য নৈরাশ্যের অনুমতি নেই। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই মারাত্মক কথা যে, অন্তর থেকে গুনাহভীতি চলে যাবে এবং অনুতপ্ত হওয়ার চেতনা সম্পূর্ণ মিটে যাবে। মানুষ যদি গুনাহর ওপর সীনাজুরি করে এবং গুনাহকে জায়েয করার জন্য অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়,

তাহলে তাতো জঘন্যতর হবেই। অনুশোচনা যতক্ষণ জাগ্রত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নিরাশার আঁধার সৃষ্টি করা যাবে না। আমাদের শায়খ কথাটি অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে এভাবে বললেন–

سوئے نوامیدی مرو کہ امید ہاست

سوئے تاریکی مرو کہ خورشید ہاست

অর্থাৎ– নিরাশার পথে যেও না। কারণ, আশার পথ একাধিক। অন্ধকার পথে চলো না। কেননা, সূর্যের উপস্থিতি অনেক। অতএব, তাওবা করে নাও, সকল গুনাহ মিটে যাবে।

শয়তান হতাশ করে

আল্লাহ তাওবার দরজা তো বন্ধ করে দেননি। তাহলে হতাশা কেন? আমাদের অন্তরে যে মাঝে মাঝে হতাশার অস্বচ্ছ কুয়াশা আনাগোনা করে এবং এ ভাবনা সৃষ্টি হয় যে, জীবনে কত পাপ করলাম, আমল বলতে কিছুই তো নেই, এখন আমার কী হবে? – এ জাতীয় ভাবনা থেকে অনেক সময় আমরা একেবারে হতাশ হয়ে যাই। মনে রাখবেন, এটাও শয়তানের ধোঁকা। মানুষের অন্তরে হতাশা ধূম্রজাল তৈরি করে তাকে আমল থেকে নিস্তেজ ও নিথর করে দেয়ার চালাকি শয়তানই করে থাকে। আমরা তো এমন মালিকের গোলাম, যিনি পরম দয়ালু ও অতি দয়াবান। আমৃত্যু যিনি আমাদের জন্য তাওবার দরজা খোলা রেখে দিয়েছেন এবং এই ঘোষণা করে রেখেছেন যে, তাওবাকারীর গুনাহ একেবারে নাম-নিশানাসহ বিলুপ্ত করে দেয়– সেই মহামহিম মালিকের গোলামকে হতাশা আক্রমণ করবে কেন? এতো আশ্চর্য বৈ কি! সুতরাং হতাশা নয়; বরং ইসতেগফার কর। সব গুনাহ এভাবেই মিটে যাবে।

গুনাহর শক্তিই বা কতটুকু?

এসব গুনাহর শক্তিইবা কতটুকু? এক মিনিটের তাওবার আঘাত সহ্য করার শক্তি এদের নেই। যত বড় গুনাহই হোক, মাত্র এক মিনিটের তাওবার আঘাতে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়। বাবা নাজম আহসান (রহ.), যাঁর কথা একটু পূর্বে বলেছিলাম, তিনি একজন কবিও ছিলেন। চমৎকার কবিতা বলতেন, তাঁর কবিতার কোমল শব্দগুলো শ্রেতার দেহ-মন ছুঁয়ে যেতো। একবার তিনি বলেছিলেন–

دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ☆ ایسی تیسی میرے گناہوں کی

'আল্লাহ যখন আমাকে 'আহ' করার দৌলত দান করেছেন, গুনাহর কারণে ভেতরটা যখন আমার অনুতপ্ত ও অস্থির, ক্ষমা প্রার্থনার শব্দগুলো যখন আল্লাহর দরবারে পেশ করছি, বিমর্ষ হৃদয়ের করুণ অনুশোচনা যখন মালিকের দরবারে প্রকাশ করছি, তখন গুনাহগুলো আমার কী ক্ষতিই বা করতে পারবে? কারণ, তাওবার পথ তো এখনও খোলা, তাহলে নিরাশার টেনশন আমাকে কেন করতে হবে?

ইসতেগফার

এ তো গেলো তাওবার কথা যে, তাওবার জন্য প্রয়োজন তিনটি জিনিসের সমন্বয়। যেগুলো ছাড়া তাওবা পূরণ হয় না কখনও। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো- ইসতেগফার। ইসতেগফার তাওবার তুলনায় আরো ব্যাপক। ইসতেগফার অর্থ- আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। হযরত ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন, তাওবার জন্য যে তিনটি শর্ত রয়েছে, ইসতেগফারের বেলায় সেগুলো প্রযোজ্য নয়। বরং প্রত্যেকেই যে কোনো অবস্থাতে ইসতেগফার করতে পারে। সুতরাং কোনো বিচ্যুতি প্রকাশ পেলে, ত্রুটি অনুভূত হলে, অসঅসা আকুলি বিকুলি করলে, ইবাদতের মাঝে অলসতা চলে আসলে- মোটকথা যে কোনো দোষ-ত্রুটি ও গুনাহর জন্য যে কোনো মুহূর্তে ইসতেগফার করা যাবে। যেমন এভাবে বলা যাবে যে-

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

'হে আল্লাহ! আমি সকল গুনাহ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি।'

এমন ব্যক্তির কি হতাশ হওয়া উচিত?

ইমাম গাযযালী (রহ.) আরো বলেছেন, মুমিনের জন্য মূল পথ হলো তাওবার পথ। আর তাওবা করতে হলে তার শর্তগুলোও পূরণ করতে হবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, এক ব্যক্তি অনেক গুনাহ ছেড়ে দিয়েছে, আর যেসব গুনাহর মাঝে এখনো পড়ে আছে, সেগুলোও ছাড়ার চেষ্টা করছে। তবে একটা গুনাহ এমন আছে, যেটি ছাড়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছে, তবুও ছাড়া সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে এমন ব্যক্তি কী করবে? সে কি তাওবার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে হাত গুটিয়ে নিবে? নিজেকে ধ্বংসের বাসিন্দা মনে করে সে কি হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে?

হারাম উপার্জনকারী কী করবে?

যেমন এক ব্যক্তি সুদি ব্যাংকে চাকুরি করে। সুদি ব্যাংকে চাকুরি করা নিঃসন্দেহে হারাম। এরপর সে দ্বীনের আলো পেয়ে দ্বীনের পথে ফিরে আসতে চাচ্ছে। ধীরে ধীরে সে নামায-রোযাও ধরেছে, অনেক গুনাহ ছেড়ে দিয়েছে,

শরীয়তের অন্যান্য বিধি-বিধানের প্রতিও এক এক করে মনোযোগী হচ্ছে। এখন তার অন্তর অস্থির হয়ে ওঠেছে শুধু তার উপার্জনকে কেন্দ্র করে। যেহেতু তার বিবি-বাচ্চা, পরিবার-পরিজন আছে, যাদের ব্যয়ভার তার ওপরই নির্ভরশীল, তাই সুদি ব্যাংকের চাকুরি বললেই তো আর ছাড়া যায় না। হ্যাঁ, সে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উপার্জনের অন্য কোনো পন্থা খুঁজে বের করার। তাহলে এ ব্যক্তি কি তাওবার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাবে? এর জন্য কি তাওবার অন্য কোনো পথ নেই?

তাওবা নয়; ইসতেগফার করবে

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন, উক্ত ব্যক্তির জন্যও পথ আছে। এ ব্যক্তি একজন বেকার মানুষ যেভাবে চাকুরি খোঁজে ঠিক অনুরূপ চেষ্টায় সেও অন্য কোনো চাকুরি খুঁজতে থাকবে এবং সাথে সাথে অধিকহারে ইসতেগফার করতে থাকবে। এ ব্যক্তি আপাতত তাওবা করবে না বরং ইসতেগফার অব্যাহত রাখবে। কারণ, তাওবার জন্য তো শর্ত হলো, তাকে চাকুরিটা ছেড়ে দিতে হবে। আর এটা তো তার পক্ষে বললেই সম্ভব হচ্ছে না। তাই সে অন্য চাকুরি না পাওয়া পর্যন্ত ইসতেগফার করতে থাকবে এবং এই দুআ করতে থাকবে যে, হে আল্লাহ! আমি জানি, আমি গুনাহ করছি। এজন্য আমি খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত। কিন্তু হে আল্লাহ! আমি তো অপারগ। চাকুরিটা ছেড়ে দেয়া আপাতত সম্ভব হচ্ছে না। দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং এ গুনাহ থেকে যেন বাঁচতে পারি তার কোনো বিকল্প পথ বের করে দিন।

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি এভাবে ইসতেগফার করতে পারবে 'ইনশাআল্লাহ' তার জন্য আল্লাহ বিকল্প পথ খুলে দিবেন। কারণ, হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন–

مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ (ترمذى، كتاب الدعوات، رقم الحديث ٣٥٥٤)

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি ইসতেগফার করে, সে গুনাহর ওপর অটল হিসাবে পরিগণিত হবে না।'

কুরআন মাজীদে অনুরূপ ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُو اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ، وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

'তারা কখনও কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের

পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের পাপ কর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না।' (সূরা আলে-ইমরান : ১৩৫)

অতএব, ইসতেগফার করতে থাকবে সর্বাবস্থায়। কোনো গুনাহ যদি ছাড়তে না পার, তবুও ইসতেগফার করবে। এমনকি কোনো কোনো বুযুর্গ এও বলেছেন যে, যে যমীনের ওপর গুনাহ সংঘটিত হয়েছে, সেই যমীনের ওপর থাকাকালীনই ইসতেগফার করো। কেননা, যখন এ যমীন তোমার গুনাহর সাক্ষ্য দেবে, তখন যেন সে তোমার ইসতেগফারেরও সাক্ষ্য দিতে পারে।

ইসতেগফারের জন্য উত্তম শব্দমালা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ওপর কুরবান হোক আমাদের সর্বস্ব। ইসতেগফারের জন্য তিনি উম্মতকে এমন শব্দমালা শিক্ষা দিয়েছেন, যদি কেউ নিজের অন্তপ্রাণকে কাজে লাগিয়ে শব্দমালা বানাতো, তাহলেও এরূপ মাধুর্যভরা শব্দ তার কল্পনায়ও আসতো না। যেমন তিনি বলেছেন–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَاعْفُ عَنَّا وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

যখন সাফা-মারওয়ার মাঝখানে তিনি সায়ী করতেন, তখন সবুজ দাগের কাছে গেলে ইসতেগফারের উক্ত শব্দমালা বলতেন।

অর্থাৎ– 'হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করুন। আমার ওপর দয়া করুন। আপনার জানামতে আমি যত গুনাহ করেছি সবগুলো ক্ষমা করে দিন। কেননা, আপনি আমার ওই গুনাহগুলো সম্পর্কেও সম্যক অবগত, যেগুলো সম্পর্কে আমি বেখবর। নিশ্চয় আপনিই সবচে' মহিমান্বিত ও সম্মানিত।'

দেখুন, এমন বহু গুনাহ আছে, যেগুলো যদিও গুনাহ, অথচ আমাদের ধারণা মতে সেগুলো কোনো গুনাহ নয়। অনেক সময় মানুষ অসতর্কতার কারণেও গুনাহ করে। মানুষ যদি নিজের সকল গুনাহ গুণতে চায়, তাহলে তার জন্য সম্ভব নয়। তাই উক্ত দুআতে বলা হয়েছে, 'যত গুনাহ সম্পর্কে আপনি জানেন, হে আল্লাহ! সবগুলো মাফ করে দিন।'

সাইয়্যেদুল ইসতেগফার

সবচে' ভালো হয়, যদি সাইয়্যেদুল ইসতেগফার তথা সকল ইসতেগফারের সরদার'কে যদি মুখস্থ করে নেয়া যায়। তাহলে এটি সব সময় পড়া যাবে এবং এটাকে প্রতি দিনের আমল করে নেয়া প্রয়োজন বটে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ - اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ
عَلَيَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِىْ، فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ، فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ
(صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ، كِتَابُ الدَّعْوَاتِ، رقم الحديث ٦٣٠٤)

অর্থাৎ- 'হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার গোলাম। আমি যথাসম্ভব আপনার অঙ্গীকার ও ওয়াদার ওপর আছি। আমি যে গুনাহ করেছি, তার অনিষ্টতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আপনার নেয়ামতসমূহকে স্বীকার করছি। আমার গুনাহগুলোর ব্যাপারেও স্বীকার করে নিচ্ছি। সুতরাং আমাকে মাফ করে দিন। কেননা, আপনি ছাড়া কেউই গুনাহগুলো মাফ করতে পারবে না।'

হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি পূর্ণ ইখলাস ও বিশ্বাসসহ সকাল বেলা ইসতেগফারের শব্দগুলো পড়বে, সন্ধ্যা আসার পূর্বে সে যদি মারা যায়, তাহলে সরাসরি জান্নাতে চলে যাবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি পূর্ণ ইখলাস ও বিশ্বাসসহ সন্ধ্যা বেলায় এটি পড়বে, সকালের পূর্বে যদি সে মারা যায়, তাহলে সোজা জান্নাতে চলে যাবে।

অতএব সকাল-সন্ধ্যার আমলস্বরূপ এ ইসতেগফারটি নিয়মিত পড়বে। বরং প্রত্যেক নামাযের পর অন্তত একবার পাঠ করবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একে উপাধি দিয়েছেন, 'সাইয়েদুল ইসতেগফার' হিসাবে। এ ইসতেগফারটি আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে শিখিয়েছেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শিখিয়েছেন তাঁর উম্মতকে– এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করতে চাচ্ছেন। নিম্নের সংক্ষিপ্ত শব্দগুলোও ইসতেগফার হিসাবে পড়া যাবে–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

'আমি আমার প্রভু, আল্লাহর কাছে সকল গুনাহ থেকে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাঁরই কাছে তাওবা করছি।'

কেউ শুধু اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ বললেও বলতে পারে। মোটকথা, ইসতেগফার করবে এবং সব সময় করবে, সর্বাবস্থায় করবে।

চমৎকার একটি হাদীস

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى فَيَغْفِرَ لَهُمْ (صَحِيْح مُسْلِمْ، كِتَابُ التَّوْبَةِ، رقم الحديث ٢٧٤٩)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোনো কথার ওপর জোর দিতে গিয়ে এ জাতীয় 'কসম' ব্যবহার করতেন) যদি তোমরা মোটেও গুনাহ না কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দিবেন এবং এমন লোকদের সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করবে, ইসতেগফারও করবে। তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।'

মানুষের মাঝে গুনাহ করার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে

এ হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে যদি গুনাহ করার যোগ্যতা মানুষের মাঝে না থাকতো, তাহলে মানবসৃষ্টির কোনো প্রয়োজনই ছিলো না। বরং তখন ফেরেশতারাই যথেষ্ট ছিলো। কারণ, ফেরেশতা আল্লাহর এমন সৃষ্টি যারা সার্বক্ষণিক ইবাদত, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদিতে মশগুল। তাদের মাঝে গুনাহ করার যোগ্যতা নেই। চাইলেও তারা গুনাহ করতে পারবে না।

আর মানুষ হলো, এমন এক প্রাণী, যাদের মধ্যে পাপের প্রবণতা এবং পাপবিরোধী যোগ্যতা সমবলীয়ান বিরোধে দ্বন্দ্বমুখর। দেখার বিষয় হলো, গুনাহর তাড়না থাকা সত্ত্বেও মানুষ গুনাহ করে কিনা। আর গুনাহ করে ফেললেও ইসতেগফার করে কিনা। সুতরাং মানুষ যদি স্বভাবজাত এ যোগ্যতাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে, তাহলে তাকে সৃষ্টি করার প্রয়োজনই বা কী ছিলো? এইজন্যই আদম (আ.)কে সৃষ্টি করার সময় ফেরেশতারা বলেছিলো, হে আল্লাহ! আপনি কী ধরনের জীব সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন, তারা তো যমীনের বুকে রক্তারক্তি করবে, ফাসাদ সৃষ্টি করবে, আর আমরা তো রাত-দিন আপনার বড়ত্ব, মহত্ব ও পবিত্রতা ইত্যাদি বর্ণনা করেই যাচ্ছি। আল্লাহ উত্তর দিয়েছিলেন–

اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

'আমি যা জানি তা তোমরা জানো না।'

এটা ফেরেশতাদের কৃতিত্ব নয়

কারণ, গুনাহ করার যোগ্যতা ফেরেশতাদের নেই। এইজন্য তারা গুনাহ করে না। প্রকৃতপক্ষে এটা কোনো কৃতিত্ব নয়। যেমন অন্ধ ব্যক্তি যদি পর নারীর প্রতি, অশ্লীল ছবির প্রতি না থাকায়, তাহলে এটা তার কোনো বিশেষত্ব নয়। অপর দিকে মানুষের মাঝে রয়েছে গুনাহ করার যোগ্যতা, সুতরাং এ যোগ্যতা থাকার পর এ থেকে বিরত থাকাই হলো প্রকৃত কৃতিত্ব। যাবতীয় গুনাহর রূপ-রস আর গন্ধ মানুষের সামনে চোখ ধাঁধিয়ে পড়ে থাকে, তখন সে এগুলো থেকে বেঁচে থাকাই হলো আসল কৃতিত্ব। এ মানুষের জন্য আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

জান্নাতের অনবদ্য সৌন্দর্য শুধু মানুষের জন্য

ভালোভাবে বুঝে নিন, ফেরেশতারা জান্নাতে থাকবে ঠিক, তবে জান্নাতের অনবদ্য সৌন্দর্য থেকে মজা নিতে পারবে না। কারণ, মজা ও বিলাসিতা গ্রহণ করার যোগ্যতাই তাদের নেই। জান্নাতের যাবতীয় নেয়ামত ও মাধুর্য আল্লাহ তাদের জন্য রেখেছেন, যাদের মাঝে গুনাহ ও নেক আমল করার যোগ্যতা সমভাবে রয়েছে। আল্লাহর হেকমতের ওপর অভিযোগ-অনুযোগ উত্থাপন করার যোগ্যতা কার আছে? আল্লাহর হেকমত সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার মতো প্রতিভাই বা কার আছে? তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন বিপরীতমুখী দু'টি যোগ্যতা দ্বারা সমৃদ্ধ করে। এরপর যদি কেউ কেউ যদি যোগ্যতাকে সঠিকভাবে ও সঠিক পথে কাজে না লাগায়, তার জন্য খোলা রেখেছেন ইসতেগফার ও তাওবার পথ। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর গাফফার, গাফুর, সাত্তার, রহীম ইত্যাদি গুণের প্রকাশ ঘটান। বান্দা যদি গুনাহই না করে, তাহলে তাঁর এসব গুণের প্রকাশ ঘটবে কিভাবে?

কুফরও হেকমত থেকে মুক্ত নয়

বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, এ পৃথিবীর কোনো বস্তুই হেকমত থেকে মুক্ত নয়, এমনকি কুফরও নয়। মাওলানা রূমী (রহ.) বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন এভাবে–

در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر است

آتش کرابسوز دگر بولہب نباشد

অর্থাৎ– 'কুদরতের এ কারখানায় কুফরেরও প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, আবু লাহাব না থাকলে জাহান্নামের আগুন কাকে পোড়াতো?'

এজন্য বলি, গুনাহও আল্লাহর ইচ্ছার অংশ। গুনাহর খাহেশ বান্দার অন্তরে তিনিই সৃষ্টি করেন, যেন বান্দা এ খাহেশকে মাড়াতে পারে এবং পোড়াতে পারে।

বান্দা খাহেশটিতে যত মাড়াবে, যত পোড়াবে ততই তাঁর অন্তরে তাকওয়ার আলো সৃষ্টি হবে।

পার্থিব লালসা এবং গুনাহ হচ্ছে জ্বালানী কাঠের মতো

উপমার জগতে মাওলানা রূমী (রহ.)-এর দৃষ্টান্ত বিরল। আল্লাহ তাঁকে এ জগতের ইমাম বানিয়েছিলেন। তিনি বলেন–

شہوت دنیا مثال گلخن است ☆ کہ از وحمام تقوی روشن است

অর্থাৎ– পার্থিব লালসা এবং গুনাহর প্রতি আকর্ষণও এ দৃষ্টিকোণে অনেক বড় বিষয় যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে জ্বালানী কাঠ হিসাবে এগুলো দান করেছেন। যেন এ জ্বালানী কাঠ জ্বালিয়ে তাকওয়ার অনির্বাণ-শিখা সৃষ্টি করতে পার। তাকওয়ার-ঘর জীবন্ত ও আলোকিত করে তুলতে প্রয়োজন হবে এ জ্বালানী কাঠের। সুতরাং গুনাহর কামনা যখন তোমাকে উত্তেজিত ও অস্থির করে তুলবে, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মতো যখন সে গর্জন করে ওঠবে, তখনি তুমি তাকে পিষে দাও। আল্লাহর জন্য তাকে নিথর ও নিস্তেজ করে দাও। তাহলে তোমার অন্তর তাকওয়ার বিভায় আলোকিত হয়ে ওঠবে।

ঈমানের স্বাদ

হাদীস শরীফে এসেছে, কারো যদি মন চায় যে, পরনারীর প্রতি একটু দৃষ্টি দিই, যৌনতার গন্ধ উপভোগ করি পরক্ষণেই যদি তার মনকে ঘুরিয়ে নেয়, আল্লাহর ভয়ে তার এ কামনাকে পিষে দেয়, তাহলে আল্লাহর ঈমানের এমন স্বাদ দান করেন, যদি সে পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দিতো, তাহলে এ স্বাদ সে মোটেও পেতো না। কেননা, ঈমানের এ স্বাদের সঙ্গে গুনাহর ক্ষণিক-স্বাদের কোনো তুলনাই হতে পারে।

গুনাহ সৃষ্টি করার হেকমত

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ যখন চান যে, বান্দা গুনাহ থেকে বিরত থাকুক, তাহলে তিনি গুনাহকে সৃষ্টি না করলেই তো পারতেন? এর উত্তর হলো, গুনাহ-সৃষ্টির পেছনে দু'টি রহস্য ও হেকমত রয়েছে। প্রথমত, বান্দা যখন গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা চালাবে, তখন তার অন্তরে তাকওয়ার প্রদীপ জ্বলে ওঠবে। গুনাহ থেকে সে যত বেশি দূরত্ব বজায় রাখবে, তত বেশি আল্লাহর নৈকট্য তার ভাগ্যে জুটবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

'আর যে আল্লাহর ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ খুলে দিবেন।' (সূরা আত্ব-ত্বালাক : ৩)

তাওবার কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি

দ্বিতীয়ত, পূর্ণ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি সে গুনাহ করে ফেলে আর মানুষ হিসাবে এটা হতেও পারে, তাহলে সে অনুতপ্ত হবে, ইসতেগফার করবে, তাওবা করবে এবং আল্লাহর দরবারে নিজের অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করে বলবে–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

'হে আল্লাহ! আমার ভুল হয়ে গেছে, গুনাহ করে ফেলেছি, এখন আপনার কাছে মাফ চাচ্ছি, তাওবা করছি।'

ফলে আল্লাহর দরবারে এ বান্দার মর্যাদা আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং সে আল্লাহর 'গাফফার' ও 'সাত্তার' গুণের প্রকাশস্থল হবে।

উক্ত কথাগুলো খুবই স্পর্শকাতর। আল্লাহ তাআলা ভুল ব্যাখ্যা থেকে আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন। সারকথা হলো, গুনাহ করার দুঃসাহস কখনও দেখাবেন না। এরপরেও একান্ত যদি করে ফেলেন, তখন নিরাশও হওয়া যাবে না। তাওবা এবং ইসতেগফারের পথ আল্লাহ এজন্যই রেখেছেন। এর দ্বারা এমন অনেক মর্যাদাই লাভ করা যায়, যে মর্যাদা গুনাহর বর্জন করার দ্বারা লাভ করা যায় না।

হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর ঘটনা

হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে প্রতি রাতে ওঠতেন। একদিন তাঁর ঘুম ভাঙ্গেনি, ফলে তিনি দিনের তাহাজ্জুদ পড়তে পারেননি। এজন্য পুরো দিনটি তিনি কান্নাকাটি করলেন, আল্লাহর দরবারে ইসতেগফার করলেন, তাওবা করলেন; মিনতি স্বরে বললেন যে, হে আল্লাহ! আমার তাহাজ্জুদ ছুটে গিয়েছে, আমি লজ্জিত, অনুতপ্ত।

পরবর্তী রাতে যখন ঘুমিয়ে গেলেন, তখন তাহাজ্জুদের সময় হলে এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জাগিয়ে তুললো। দেখতে পেলেন, এক অপরিচিত লোক তাঁকে জাগিয়েছে আর এখন দাঁড়িয়ে আছে। মুয়াবিয়া (রাযি.) তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। সে উত্তর দিলো, আমি ইবলিস। উত্তর শুনে মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর কণ্ঠে মুগ্ধতা ঝরে পড়লো। বললেন, যদি তুমি ইবলিসই হও, তবে তাহাজ্জুদের জন্য আমাকে জাগালে কেন? তোমার মতলবটা কী? ইবলিস উত্তর দিলো, আগে উঠুন। তাহাজ্জুদটা পড়ে নিন। মুয়াবিয়া (রাযি.) বললেন, বাহ! তাহাজ্জুদের খবরও দেখি তুমি রাখ। তোমার কাজ তো তাহাজ্জুদ থেকে বাধা দেয়া, অথচ আজ এর বিপরীত করলে, এটা তুমি কোথেকে শিখলে? সে উত্তর দিলো, আসল ব্যাপার হচ্ছে, গত রাতে আমি তাহাজ্জুদ থেকে আপনাকে বিরত রেখেছিলাম। আপনার তাহাজ্জুদ কাযা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনিই বা কম করলেন কই,

সারাদিন কান্নাকাটি করলেন, ইসতেগফার করলেন, তাওবা করলেন, ফলে আমার চাতুরতা বিফল হয় আর আপনার মর্যাদা এত বেশি বেড়ে যায় যে, তাহাজ্জুদ পড়লে সেই মর্যাদা পেতেন না। এইজন্য আপনার তাহাজ্জুদ পড়াটাই আমার জন্য ভালো। তাই আজ আমি নিজেই জাগাতে এসেছি, যেন আপনার শান এভাবে আর বাড়তে না পারে।

প্রতীয়মান হলো, তাওবা-ইসতেগফার মানুষকে অনেক মর্যাদাশীল করে, যা গুনাহ বর্জনের কারণে কিংবা ইবাদতের কারণেও অনেক সময় হয়ে ওঠে না।

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা ফরয

অনেক সময় মনে জাগে যে, তাহলে তো গুনাহ বর্জনের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই। গুনাহ করবো আর তাওবা-ইসতেগফার করবো– এভাবেই তো সব হয়ে যাবে। জেনে রাখুন, এ ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। বরং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয হলো, গুনাহ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা। এরপরেও যদি হয়ে যায়, তখন হতাশায় না পড়ে তাওবা করবে।

অসুস্থতার কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি

অসুস্থতার কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়– হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, অসুস্থতা কামনা করবে; বরং তখনও অসুস্থতা থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। অনুরূপভাবে গুনাহর বিষয়টিও। গুনাহ গ্রহণীয় বস্তু নয় বরং বর্জনীয় বস্তু। এরপরেও অসতর্কতার কারণে হয়ে গেলে তার জন্যও পথ খোলা।

তাওবা ও ইসতেগফারের প্রকারভেদ

তাওবা ও ইসতেগফার তিন প্রকার–

১. গুনাহসমূহ থেকে তাওবা-ইসতেগফার।

২. ইবাদত বা আল্লাহর হুকুম পালনে ত্রুটি হলে তা থেকে তাওবা-ইসতেগফার।

৩. ইসতেগফার থেকে ইসতেগফার অর্থাৎ ইসতেগফারেরও একটা হক আছে, তা যথাযথভাবে আদায় করতে পারিনি, এজন্য ইসতেগফার করছি।

তাওবা পূর্ণ করা

প্রথম প্রকার তথা গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করা প্রত্যেক মানুষের ওপর ফরযে আইন। এটা অমান্য করার অধিকার কোনো মানুষের নেই। এই জন্যই তাসাওউফ ও তরীকতের প্রথম কর্মসূচি হলো, 'তাকমীলে তাওবা' তথা তাওবা পূর্ণ করা। উন্নতির সকল স্তর ও 'তাকমীলে তাওবা'র ওপর নির্ভরশীল। যতক্ষণ

পর্যন্ত তাওবা পূর্ণ হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু অর্জিত হবে না। হক্কানী পীর সাহেবরা এইজন্য সর্বপ্রথম 'তাকমীলে তাওবা' করান। ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন–

هُوَ اَوَّلُ اِقْدَامِ الْمُرِيْدِيْنَ

অর্থাৎ– মুরীদদের সর্বপ্রথম কাজ হলো তাওবা সম্পন্ন করা।

সংক্ষিপ্ত তাওবা

পীর-মাশায়েখগণ বলেন, তাকমীলে তাওবার দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথমত. সংক্ষিপ্ত তাওবা; দ্বিতীয়ত. বিস্তারিত তাওবা। ইজমালী তাওবা তথা সংক্ষিপ্ত তাওবা বলা হয়, স্থিরতার সঙ্গে বসে একেবারে জীবনের সকল গুনাহর কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে তাওবা করা। এ স্তরের তাওবার জন্য উত্তম পদ্ধতি হলো, প্রথমে তাওবার নিয়তে দু' রাকাআত নামায পড়ে নিবে। তারপর আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে, লজ্জিত ভঙ্গিতে, অনুতপ্ত হয়ে একেকটি গুনাহর কথা স্মরণ করবে এবং এ দুআ করবে যে, হে আল্লাহ! প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, আল্লাহর হক কিংবা বান্দার হকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সগীরা গুনাহ কিংবা কবীরা গুনাহ– মোটকথা জীবনে যত গুনাহ করেছি, সবগুলো থেকে তাওবা করছি।

বিস্তারিত তাওবা

ইজমালী তাওবা তথা সংক্ষিপ্ত তাওবা শেষ করার পর নিশ্চিন্ত বসে থাকলে চলবে না বরং এরপর তাওবায়ে তাফসীলী তথা বিস্তারিত তাওবা করতে হবে। আর তার পদ্ধতি হলো, যেসব গুনাহ তাৎক্ষণিকভাবে শোধরানো সম্ভব, সেগুলো শোধরানোর কাজ শুরু করে দিতে হবে। যতক্ষণ না এটা করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার তাওবা পূর্ণতা লাভ করবে না। যেমন এক ব্যক্তির ফরয নামায কাযা হয়েছে অনেক। এখন সে তাওবার প্রতি মনোযোগী হয়েছে, তাহলে সর্বপ্রথম ছুটে যাওয়া নামাযগুলো কাযা করা শুরু করে দিতে হবে। কারণ, মৃত্যুর পূর্বে হলেও এসব নামায তাকে আদায় করতেই হবে। এখন সংক্ষিপ্ত তাওবা করার পর যদি সে বিনা চিন্তায় বসে থাকে, নামাযগুলো পূর্ণ করা আরম্ভ না করে, তাহলে তার তাওবা সম্পন্ন হবে না। আত্মশুদ্ধির জন্য এ তাফসীলী তাওবা অত্যন্ত জরুরি।

নামাযের হিসাব করতে হবে

তাফসীলী তথা বিস্তারিত তাওবার মধ্যে সর্বপ্রথম আসে নামাযের বিষয়টি। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে শুরু হবে এর হিসাব। পুরুষ স্বপ্নদোষের পর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হয় আর নারী ঋতুস্রাবের পর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। কারো যদি উক্ত আলামত প্রকাশ না পায়, তাহলে পুরুষ-নারী উভয়ের জন্য পনের বছর বয়স

হলো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বয়স। এরপর থেকে নামায, রোযা এবং দ্বীনের অন্যান্য বিধি-বিধান পালন করা তার কর্তব্য।

সুতরাং হিসাব করতে হবে, যে দিন থেকে আমি উক্ত বয়সে উপনীত হয়েছি, সে দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কত ওয়াক্ত নামায আমার থেকে ছুটে গেছে, সবগুলো কাযা করা আমার যিম্মায় ফরয। এক্ষেত্রে যদি সঠিক হিসাব বের করা সম্ভব না হয়, তাহলে সম্ভাব্য একটা হিসাব ধরতে হবে, যেন কম নয় বরং বেশিই হয়– তারপর সেটা ডায়রী বা খাতায় লিখে ফেলতে হবে যে, আজ এত তারিখ পর্যন্ত আমার নামায মোট এই পরিমাণে কাযা হয়েছে। যদি মৃত্যুর আগে এসব নামায কাযা করতে পারি, তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। অন্যথায় আমি অসিয়ত করছি, মৃত্যুর পর আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নামাযগুলোর ফিদয়া যেন আদায় করে দেয়া হয়।

অসিয়তনামা লিখে নিবে

উক্ত অসিয়ত কেন লিখতে হবে? এজন্য লিখতে হবে যে, যদি আপনি অসিয়তটি না লিখেন, আর কাযা নামাযগুলো আদায় করার পূর্বেই মারা যান, তখন ওয়ারিশদের যিম্মায় আপনার নামাযগুলোর ফিদয়া আদায় করা জরুরি নয়। আদায় করলে আপনার ওপর দয়া করা হবে। অন্যথায় শরীয়তের দৃষ্টিতে আদায় করা জরুরি নয়।

কিন্তু যদি অসিয়ত করেন, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়ারিশরা এ যিম্মাদার হবে যে, আপনার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ তারা আপনার অসিয়ত বাবদ ব্যয় করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের ওপর ঈমান রাখে এবং অসিয়ত লেখার মতো তার কাছে কোনো বিষয় থাকে, তাহলে অসিয়ত লেখা ব্যতীত মাত্র দু' রাত অতিক্রম করাও তার জন্য জায়েয নেই। (তিরমিযী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩)

সুতরাং কাযা নামাযগুলোর জন্যও অসিয়ত লিখবেন। একটু আত্মজিজ্ঞাসা করুন, কয়জন এ কর্তব্য পালন করেছেন? অথচ অসিয়তনামা না লেখাও স্বতন্ত্র একটি গুনাহ। যতদিন এ অসিয়তনামা লিখবেন না, ততদিন গুনাহটি আপনার ঘাড়ে ঝুলে থাকবে। তাই অসিয়ত লিখুন এবং আজই লিখুন।

উমরী কাযা আদায়

তারপর কাযা নামাযগুলো আদায় করা শুরু করে দিন। এগুলোকে বলা হয় উমরী কাযা। এগুলো আদায়ের পদ্ধতি হলো, প্রত্যেক ওয়াক্ত ফরয নামাযের আগে কিংবা পরে একটি কাযা নামাযও পড়ে নিবেন। সময় বেশি থাকলে দু'

ওয়াক্ত কাযা নামায পড়ে নিবেন। যত তাড়াতাড়ি এগুলো শেষ করতে পারেন, ততই ভালো। বরং ওয়াক্তিয়া নামাযের সঙ্গে নফল নামায না পড়ে এসব কাযা নামায আদায় করুন। ফযরের নামযের পর এবং আসরের নামাযের পর নফল নামায পড়া নাজায়েয কিন্তু কাযা নামায পড়া জায়েয। আল্লাহ তাআলা বিষয়টি এতই সহজ করেছেন। যত ওয়াক্ত নামায এভাবে আদায় করবেন, সেটার হিসাবও ডায়রীতে লিখে রাখবেন।

সুন্নাতের স্থলে কাযা নামায পড়া নাজায়েয

কেউ কেউ মাসআলা জিজ্ঞেস করে যে, আমার যিম্মায় কাযা নামায অনেক। এখন এসব নামায কি সুন্নাতের স্থলে পড়ে নিতে পারবো? এর উত্তর হলো, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়তেই হবে। তা ত্যাগ করা জায়েয হবে না। হ্যাঁ, নফলের স্থলে কাযা নামায পড়তে পারবেন।

কাযা রোযাগুলোর হিসাব

নামাযের মতো রোযার হিসাব নিবেন। বালেগ হওয়ার পর থেকে কতটি রোযা ছুটে গেছে, এর একটা হিসাব বের করবেন। যদি না ছুটে থাকে, তাহলে তো ভালো কথা। আর ছুটে গিয়ে থাকলে এটাও ডায়রিতে লিখে রাখবেন যে, আজ অমুক তারিখ পর্যন্ত এতটি রোযা আমার যিম্মায় রয়ে গেছে। এগুলো আমি আদায় করিনি। আমি যদি মারা যাই, তাহলে আমার পরিত্যক্ত-সম্পত্তি থেকে এগুলোর ফিদয়া আদায় করে দিতে হবে। তারপর এক এক করে রোযাগুলো আদায় করতে থাকুন এবং কতটি আদায় করেছেন, তার হিসাবও ডায়রিতে লিখে রাখুন। যেন হিসাব স্পষ্ট থাকে।

যাকাতের হিসাব এবং অসিয়ত

অনুরূপভাবে যাকাতেরও হিসাব নিবেন। বালেগ হওয়ার পর থেকেই নিসাবের মালিক হলে তার ওপর যাকাত ফরয নয়। সুতরাং এ জাতীয় কোনো যাকাত যদি অনাদায়ী থেকে যায়, তাহলে তারও হিসাব বের করুন। প্রত্যেক বছরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হিসাব করুন। মনে না থাকলে, আন্দাজ করে হলেও একটা হিসাব বের করুন। আন্দাজের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যাকাতের পরিমাণ যেন বেশি হয়। কারণ, বেশি হলে কোনো সমস্যা নেই, তবে কম হলে সমস্যা আছে। হিসাব বের করার পর সেগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদায় করে দিন। ডায়রিতেও অসিয়ত লিখে রাখুন। যা আদায় করবেন, তাও ডায়রিতে লিখে নিবেন।

হজ্জের ব্যাপারে ওই একই মাসআলা। হজ্জ ফরয হওয়ার পরও অনাদায়ী থেকে গেলে তাড়াতাড়ি আদায় করে নিন। আদায় করার আগ পর্যন্ত ডায়রিতে লিখে রাখুন। এসবই হুকুকুল্লাহ। এগুলো আদায় করা 'তাফসীলী তাওবা'র অন্তর্ভুক্ত।

বান্দার হক আদায় করবেন অথবা মাফ করিয়ে নিবেন

এরপর বান্দার হকের ফিকির করুন। আপনার যিম্মায় এ জাতীয় কোনো হক অনাদায়ী থেকে গেলে তা আদায় করে দিন। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে মাফ চেয়ে নিন। মাফ করলে তো ভালো কথা। অন্যথায় আপনাকেই আদায় করতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নিজে সাহাবায়ে কেরামের দলের মাঝে দাঁড়িয়ে এ ঘোষণা দিয়েছিলেন যে–

'আমি যদি কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকি, দুঃখ দিয়ে থাকি কিংবা আমার ওপর যদি কারো কোনো হক থেকে থাকে, তাহলে আজ আমি সকলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, সে ব্যক্তি এসে আমার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিক অথবা আমাকে ক্ষমা করে দিক।'

দেখুন, যেখানে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মাফ চাচ্ছেন, সেখানে আমার আর আপনার মর্যাদাই বা কতটুকু? অতএব, জীবন চলার পথে যত জনের সঙ্গে ওঠা-বসা, চলাফেরা রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এ কর্মে কথা বলুন, কিংবা চিঠি লিখুন যে, আমার ওপর আপনাদের কোনো হক আছে কিনা? যদি থাকে, তাহলে তা আদায় করে দিন। কারো যদি গীবত করে থাকেন কিংবা কাউকে যদি দুঃখ দিয়ে থাকেন, তাহলে তাও মাফ চেয়ে নিন। কেননা, এ সবই বান্দার হক।

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, কেউ যদি অপরের ওপর শারীরিক কিংবা আর্থিক জুলুম করে, তাহলে আজই যেন মাফ চেয়ে নেয় কিংবা প্রাপকের কাছে যেন তার সোনা-রুপা পৌঁছিয়ে দেয়, ওই দিন আসার পূর্বে যে দিন দিনার-দিরহাম, সোনা-রুপা কোনো কাজে আসবে না।

যারা আখেরাতের পথিক তাদের অবস্থা

আল্লাহ যাদেরকে আখেরাত-চেতনা দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, তারা এক এক করে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতেন কিংবা মাফ চেয়ে নিতেন। এ সুন্নাতের ওপর আমল করতে গিয়ে হযরত থানবী (রহ.) 'আল উযর ওয়ান নাযর' নামক স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন এবং বন্ধু-বান্ধব সকলের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, 'আপনাদের সঙ্গে যেহেতু আমার একটা

ঘনিষ্টতা আছে, তাই আল্লাহই ভালো জানেন কখন আপনাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছি? হতে পারে ভুলচুক হয়ে গেছে। কিংবা কোনো ওয়াজিব হক আমার যিম্মায় রয়ে গেছে। আল্লাহর ওয়াস্তে এ মুহূর্তে সে হকটি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিন কিংবা মাফ করে দিন।

অনুরূপভাবে আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)ও এ সুন্নাতের আমল করেছেন। তাই প্রত্যেকেই এ সুন্নাতটির প্রতি যত্ন নেয়া উচিত। উক্ত কথাগুলো তাফসীলী তাওবা তথা বিস্তারিত তাওবারই অংশ।

বান্দার হক যদি রয়ে যায়

আল্লাহর হক তাওবা দ্বারা মাফ হয়ে যায়। কিন্তু বান্দার হক শুধু তাওবার মাধ্যমে মাফ হয় না বরং এর জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তার হক বুঝিয়ে দেয়া কিংবা তার পক্ষ থেকে মাফ লাভ করা। কিন্তু হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, যদি এমন হয় যে, এক ব্যক্তির সারাটা জীবন কেটেছে অপরের হক মেরে। তারপর তার বোধোদয় হলো, সে তাওবা করলো এবং খুঁজে খুঁজে প্রত্যেকের হক প্রত্যেককে বুঝিয়ে দেয়ার কাজও অব্যাহত রাখলো, সকলকে হক এখনও বুঝিয়ে দিতে পারেনি, এরই মধ্যে তার মৃত্যু হয়ে গেলো, তাহলে আখেরাতের শাস্তি থেকে এমন ব্যক্তি কী মুক্তি পাবে না? থানবী (রহ.) বলেন, এ ব্যক্তিও নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কেননা, সে তো হক আদায়ের পথে, তাওবার পথেও হেদায়াতের পথে ফিরে এসেছিলো, তাই ইনশাআল্লাহ আখেরাতে সে মাফ পেয়ে যাবে। হকদাররা তাকে ক্ষমা করে দিবে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

মাগফিরাতের এক বিস্ময়কর ঘটনা

তারপর হযরত থানবী (রহ.) প্রমাণ হিসাবে সেই বিখ্যাত ঘটনা পেশ করেছেন, যা হাদীস শরীফে এসেছে। এক ব্যক্তি নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলো। এরপর সে তাওবা করার ইচ্ছা করলো এবং কঠিন ভাবনায় পড়ে গেলো। ভাবলো, এখন আমি কী করতে পারি? ভাবনায় তাড়িত হয়ে সে গেলো এক খ্রিস্টান পাদ্রীর নিকট। বললো, আমি নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করে এসেছি, এখন আমার জন্য তাওবার দরজা খোলা আছে কি? পাদ্রী উত্তর দিলো, 'তুমি ধ্বংসের অতলান্ত সাগরে ডুবে গিয়েছ, এখন ধ্বংস ছাড়া তোমার ভাগ্যে কিছুই নেই। তোমার জন্য তাওবার পথ খোলা নেই। কথাটি শুনে ওই ব্যক্তি একেবারে হতাশ হয়ে পড়লো, চিন্তা করলো, নিরানব্বইজনের হন্তা আমি, এখন একশ' সংখ্যা পূর্ণ করাই শ্রেয় হবে– এ ভেবে সে পাদ্রীকেও হত্যা করে দিলো এবং শতকের ঘরটি পূর্ণ করে নিলো।

কিন্তু তার ভেতরটা যেহেতু তাওবার চিন্তায় অস্থির ছিলো, তাই সে পুনরায় কোনো আল্লাহওয়ালার সন্ধানে বের হয়ে পড়লো। খুঁজতে খুঁজতে এক আল্লাহওয়ালার সন্ধান পেয়ে গেলো। লোকটি তাঁর কাছে পূর্ণ বৃত্তান্ত খুলে বললো। আল্লাহওয়ালা তখন তাকে সান্ত্বনা বাণী শোনালেন যে, হতাশ হয়ো না, আগে তুমি তাওবা কর। তারপর এই এলাকা ত্যাগ করে অমুক এলাকায় চলে যাও। সেখানে নেককার লোকেরা বসবাস করে, তাদের সংস্পর্শে দিন কাটাও। যেহেতু লোকটি তাওবার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলো, তাই সে ওই এলাকার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো। পথিমধ্যে মৃত্যু তাকে হানা দিলো। কথিত আছে, যখন লোকটি প্রাণ বের হচ্ছিলো, তখনও সে হামাগুড়ি দিয়ে ওই বসতির দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছিলো, যাতে নেককারদের বসতির দূরত্ব কিছুটা হলেও কমিয়ে আনা যায়। এভাবে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো, তার রূহকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রহমতের ফেরেশতা এলো, আযাবের ফেরেশতাও এলো। উভয়ের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিলো। রহমতের ফেরেশতার বক্তব্য হলো, যেহেতু লোকটি তাওবা করেছিলো এবং নেককারদের সংস্পর্শ পাওয়ার আশায় সে দিকেই যাচ্ছিলো, অতএব তার রূহ আমরাই নিবো। আযাবের ফেরেশতা বললো, না, এ হতে পারে না। কারণ, সে একশ' লোকের হত্যাকারী এবং তার ক্ষমার কথা ঘোষণা দেয়নি, সুতরাং তার রূহ নিবো আমরা। অবশেষে আল্লাহ মীমাংসা দিলেন এভাবে যে, দেখতে হবে– যেখানে সে মারা গেছে, সেখান থেকে তার বাড়ি বেশি নিকটে, নাকি নেককারদের বসতি বেশি কাছে। পরে দেখা গেলো, নেককার লোকদের বসতি অধিক কাছে। তাই রহমতের ফেরেশতাই তার রূহ নিয়ে গেলো। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬৬)

উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত থানবী (রহ.) বলেন, যদিও লোকটির যিম্মায় বান্দার হক ছিলো, তবুও যেহেতু সে ক্ষমা লাভের চেষ্টা সর্বাত্মকভাবে করেছিলো, তাই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয়, কেউ যদি বান্দার হকের ব্যাপারে তাওবা করে এবং হক আদায়ের জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে, এরই মধ্যে যদি সে মারা যায়, আল্লাহ তার ওপর দয়া করবেন এবং হকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অন্যভাবে খুশি করে দিবেন।

মোটকথা, ইজমালী তাওবা এবং তাফসীলী তাওবা তথা সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত উভয়টাই করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

অতীত গুনাহর কথা ভুলে যাও

এ প্রসঙ্গে হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলতেন, তখন তোমরা এ দুই প্রকারের তাওবা করবে, তখন থেকে পেছনের গুনাহর কথা একেবারে ভুলে

যাবে। যেসব গুনাহ থেকে তাওবা করেছো, পুনরায় সেগুলো স্মরণ করার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার মাগফিরাতের অবমূল্যায়ন করা। কারণ, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তাওবা করলে তা তিনি কবুল করে নিবেন এবং গুনাহ মাফ করে দিবেন এমনকি আমলনামা থেকেও একেবারে বিলুপ্ত করে দিবেন।

এখন চিন্তা কর, আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন অথচ তোমরা সেটা জপ করতে থাকলে এটা তো রহমতের অবমূল্যায়ন বরং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশেরই নামান্তর। কেননা, ওগুলো স্মরণ করলে অনেক সময় বিপত্তি সৃষ্টি হয়। সুতরাং অতীত গুনাহ স্মরণ করে কী লাভ, বরং স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলা।

মনে ওঠলে ইসতেগফার পড়ো

মুহাক্কিক এবং গায়রে মুহাক্কিকের মাঝে পার্থক্য এটাই। গায়রে মুহাক্কিক অনেক সময় উল্টো নির্দেশনা দিয়ে বসে। আমার একজন বন্ধু ছিলেন– নেককার বন্ধু। সব সময় রোযা রাখতেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। এক পীর সাহেবের সঙ্গে তাঁর ইসলাহী সম্পর্ক ছিলো। একদিন বন্ধু আমাকে বললেন, তাহাজ্জুদ পড়তে ওঠলে অতীত-বর্তমানের সব গুনাহর কথা স্মরণ করে খুব কাঁদবে। কিন্তু আমাদের ডা. আবদুল হাই (রহ.) বলেছেন, এ পদ্ধতিটি সঠিক নয়। কারণ, তাওবা করার দ্বারা অতীত সকল গুনাহ শুধু মাফই হয় না বরং আমলনামা থেকেও মিটে যায়। এখন ওগুলো পুনরায় স্মরণ করার অর্থ হলো, তুমি প্রমাণ করতে চাচ্ছো যে, ওই গুনাহগুলো এখনও রয়ে গেছে, মিটিয়ে দেয়া হয়নি। তাই স্মরণ রাখার মাধ্যমে সেগুলো পুনরায় সতেজ করা হচ্ছে। এজন্য যে গুনাহ সম্পর্কে তাওবা করেছ, তা অন্তর থেকেও মুছে দাও। অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে পড়ে গেলেও মনে পড়ার জন্য ইসতেগফার করে নিবে।

বর্তমান শোধরাও

চমৎকার বলতে পারতেন ডা. আবদুল হাই (রহ.)। তিনি বলেন, তাওবা করার অতীতের চিন্তা মাথায় আনবে না। তাওবা করে এ আশা রাখ যে, আল্লাহ অবশ্যই মাফ করে দিবেন।

তেমনিভাবে আগামীতে কী হবে, না হবে– এ জাতীয় চিন্তাও ছেড়ে দাও। ফিকির কর বর্তমানকে নিয়ে। বর্তমানকে কীভাবে শুদ্ধ করা যায়, সেই চিন্তা কর। বর্তমান কীভাবে ইবাদতের মধ্য দিয়ে এবং গুনাহ বর্জনের মধ্য দিয়ে কাটানো যায়– সে চিন্তাতেই অস্থির থাক।

আমাদের অবস্থা হলো, আমরা অতীত নিয়ে পড়ে থাকি। ভাবতে থাকি, এত গুনাহ করে ফেললাম এখন কী হবে– ক্ষমা কীভাবে পাওয়া যাবে? এ কারণেই হতাশার অস্বচ্ছ কুয়াশা আমাদেরকে ঘিরে ফেলে। যার কারণে বর্তমানটাও

এলোমেলো হয়ে যায়। তেমনিভাবে ভবিষ্যতের অহেতুক চিন্তায়ও আমরা কখনও নিমগ্ন হয়ে পড়ি। বিমর্ষ মনে ভাবি, এখনই তাওবা করলে ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবো কি?

শোনো! এসব অতীত-ভবিষ্যত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো। এখনকার বর্তমানও তো একটু পরে অতীত হচ্ছে এবং অনাগত ভবিষ্যতটিও তো একটু পরে বর্তমান হয়ে যাচ্ছে। এজন্য সংশোধনের চিন্তা করবে তো বর্তমানকে নিয়ে করো। অতীত-ভবিষ্যত মাথায় গিজগিজ করতে থাকলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। এটা শয়তানের পাতানো ফাঁদ। এ ফাঁদে পা দিয়ো না। 'আল্লাহ আমাদেরকে এ জাতীয় চিন্তা-চেতনা দান করুন। আমীন।'

عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ لَمَّا لَعَنَ اِبْلِيْسَ سَئَلَهُ النَّظْرَةَ، فَانْظَرَهُ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، قَالَ : وَعِزَّتِكَ لَا اَخْرُجُ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ مَا دَامَ فِيْهِ الرُّوْحُ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَعِزَّتِىْ لَا اَحْجُبُ عَنْهُ التَّوْبَةَ مَادَامَ الرُّوْحُ فِى الْجَسَدِ

সর্বোত্তম যামানা

হযরত আবু কালাবাহ (রহ.) ছিলেন একজন বড় মাপের তাবেয়ী। হযরত আনাস (রাযি.) সহ বহু সাহাবীর সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন। উক্ত হাদীসটি তিনি বর্ণনা করেছেন, যদিও বর্ণনার সময় তিনি নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন; কিন্তু আসলে এটি তাঁর নিজের কথা নয় বরং ক্রুটি হাদীস। তবে নিজের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে বয়ান করার কারণ হলো সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন। অর্থাৎ– না জানি, হাদীস হিসাবে বর্ণনা করতে গেলে কথা এদিক-সেদিক হয়ে যায় কিনা। যার কারণে নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতিপাদ্য ব্যক্তিকে পরিণত হন কিনা। যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ، كِتَابُ الْعِلْمِ)

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করলো, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।'

এত কঠিন বাণী সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের অন্তপ্রাণে গেঁথে গিয়েছিল বিধায় তাঁরা এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন খুব বেশি।

হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত

এক তাবেয়ী এক সাহাবী সম্পর্কে বলেন যে, যখন তিনি আমাদের সামনে হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন রক্তিম হয়ে যেতেন, মৃদু মূর্ছনায় কাঁপুনি শুরু হতো তাঁর। কারণ, না জানি কোনো ভুল বর্ণনা বলে ফেলি কিনা– এ ভয়ে তটস্থ থাকতেন তিনি। এ ঘটনা আমাদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। অনেক সময় আমরা খাম-খেয়ালীভাবে হাদীস বলে ফেলি। তাই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। শব্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়ার পূর্বে হাদীস বয়ান করা উচিত নয়।

যাক, উক্ত হাদীসে হযরত আবু কালাবাহ (রহ.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন ইবলিসকে অভিসম্পাত দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন, তখন সে অবকাশের প্রার্থনা করেছিলো, তারপর তাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা অবকাশ দিয়েছিলেন। তখন সে বলেছিলো, আপনার ইজ্জতের কসম! আমি মানুষের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখবো, তার মৃত্যু পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা তখন তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, আমার ইজ্জতের কসম! আমি তার থেকে তাওবার পর্দা ওঠাবো না, তার মৃত্যু পর্যন্ত।

ইবলিস যদিও সত্য বলেছিলো, তবে

ইবলিস কেন অভিশপ্ত হলো? কারণ, সে আদম (আ.)কে সিজদা করেনি। যুক্তির বিচারে ইবলিসের এ কাজটি একেবারে মন্দ বলা যাবে না। কারণ, ইবলিস হঠকারিতা না দেখিয়ে যদি তার কথাগুলো এভাবে বলতো যে, হে আল্লাহ! আমি মাটির এ পুতুলটিকে সিজদা করবো কেন? এ কপাল তো আপনার জন্য, সুতরাং আমার সিজদাও আপনারই জন্য হবে– এভাবে সে বললে যুক্তির বিচারে তার কথাটা সম্পূর্ণ মন্দ নয়।

হ্যাঁ, দৃশ্যত যক্তির বিচারে কথাটা মন্দ না হলেও বাস্তবতা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ, যে সত্তার সামনে তাকে সিজদা করতে হয়, সেই সত্তাই নির্দেশ দিচ্ছেন এ মাটির পুতুলকে সিজদা করার জন্য। সুতরাং ইবলিসের উচিত ছিলো, কোনো বাক্য ব্যয় না করার। এ নির্দেশের পর তার বুদ্ধির ঘোড়াকে না দাবড়ানো উচিত ছিলো। মাটির এ পুতুলটি সিজদাযোগ্য কিনা, এটা তো তার বিবেচ্য বিষয় ছিলো না। মাটির পুতুলকে সিজদা করার নির্দেশ তো তাঁরই, যিনি আসলেই সিজদা পাওয়ার উপযুক্ত।

দেখুন, মানুষ তো বাস্তবেই সিজদা পাওয়ার উপযুক্ত নয়। এ কারণেই আখেরী উম্মতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এ নির্দেশ দিয়েছেন

যে, তোমরা কোনোভাবেই সিজদা করবে না। এতে বুঝা যায়, এটাই হলো আসল হুকুম। কিন্তু এরপরেও আল্লাহ যখন আদম (আ.)কে সিজদা করার জন্য বলেছেন, তখন শয়তানের উচিত ছিলো এক্ষেত্রে কোনো যুক্তি না খাটানোর। তবুও সে বুদ্ধির ঘোড়া দৌড়াল– আর এটাই তার প্রকৃত ভুল।

আমি আদম থেকে শ্রেষ্ঠ

তার দ্বিতীয় ভুলটি ছিলো, সিজদা না করার কারণ হিসাবে সে একথা বলেনি যে, হে আল্লাহ! এ কপাল তো আপনার জন্যই। বরং সে 'কারণ' হিসেবে বলেছিলো, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে। আর আগুন উত্তম মাটি থেকে, তাই আমি সিজদা করবো না। পরিণামে আল্লাহ তাকে তার দরবার থেকে বহিষ্কার করে দিলেন।

সে আল্লাহর কাছে সুযোগের প্রার্থনা করেছে

যখন তাকে দরবারে ইলাহী থেকে বহিষ্কার করা হয়, তখন সে সুযোগ প্রার্থনা করেছিলো এবং বলেছিলো–

أَنْظِرْنِىْ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

'আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।' (সূরা আল-আরাফ : ১৪)

অর্থাৎ– কিয়ামত পর্যন্ত যেন আমি জীবিত থাকতে পারি, সে সুযোগ দিন।

শয়তান বড় আরেফ ছিলো

হযরত থানবী (রহ.) বলতেন, উক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, ইবলিস আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতো। সে বহু বড় আরিফ বিল্লাহ ছিলো। কারণ, একদিকে সে বিতাড়িত হতে যাচ্ছে, আল্লাহর গযবের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার কারণে জান্নাত থেকে চিরতরে বের হয়ে যাচ্ছে, অপর দিকে ঠিক আল্লাহর এ গোস্বার মুহূর্তেও সে প্রার্থনা করছে এবং নিজের অবকাশ ও সুযোগ নিশ্চিত করে নিয়েছে। কারণ, সে জানতো আল্লাহর গযব তাঁর রহমতের জন্য প্রতিবন্ধক নয়, তিনি গোস্বার কাছে পরাজিত হন না বরং গোস্বা অবস্থায়ও কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি দেন। তাই ইবলিস নিজের সুযোগটা চেয়ে নিয়েছে।

মানুষকে তার মৃত্যু পর্যন্ত ধোঁকা দিতে থাকবো

ইবলিসের প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ

'তোমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছি, কিয়ামত পর্যন্ত তুমি মরবে না।'

ইবলিস অবকাশ পেয়ে আল্লাহকে সম্বোধন করে বললো, 'হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম খেয়ে বলছি, বনী আদমের শরীরে যতদিন প্রাণ থাকবে, ততদিন তার অন্তরে আমি জেঁকে থাকবো। বনী আদমের কারণে আমি আপনার দরবার থেকে বিতাড়িত হচ্ছি, তাই তাদেরকে আমি কুমন্ত্রণা দিবো, ধোঁকা দিবো, গুনাহর তাড়না তাদের মাঝে জাগিয়ে তুলবো, গুনাহর উষ্ণ আহ্বানের সঙ্গে তাদেরকে ঘনিষ্ঠ করে তুলবো– যতদিন তারা জীবিত থাকবে।

মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাওবা কবুল করে যাবো

ইবলিসের উক্ত কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাকে উত্তর দিয়েছিলেন, আমিও আমার ইজ্জতের কসম খেয়ে বলছি, বনী আদমের শরীরের যতদিন প্রাণ থাকবে, ততদিন আমিও তার জন্য তাওবার পথ উন্মুক্ত রাখবো। তুমি আমার ইজ্জতের কসম খেয়ে বলছো, বনী আদমের আমৃত্যু তুমি কুমন্ত্রণা দিয়ে যাবে। শোনো! আমিও আমার ইজ্জতের কসম খেয়ে বলছি, আমি তার জন্য তাওবার পথ বন্ধ করবো না। তুমি যদি বনী আদমের জন্য বিষ হও, তাহলে আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য বিষের প্রতিষেধকও দিয়ে দিলাম। তাহলো তাওবা। তোমার সকল কারসাজি, ছল-চাতুরি বনী আদমের মাত্র একবারের তাওবায় বিলীন হয়ে যাবে।

আল্লাহর উক্ত ঘোষণা মূলত মানুষের জন্য তাঁর ব্যাপক রহমত দানের ঘোষণা। মানুষের শক্তি-সামর্থ বহির্ভূত কোনো কিছু আল্লাহ দেন না। সুতরাং আল্লাহ ইবলিসকে অবকাশ দিয়েছেন– এর দ্বারা এটা মনে করা যাবে না যে, ইবলিসের মোকাবেলা করা তো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং ইবলিসকে পরাজিত করা সম্ভব। এক্ষেত্রে তাওবা হলো সর্বপ্রধান হাতিয়ার।

শয়তান একটি পরীক্ষা

আসলে আল্লাহ শয়তানকে সৃষ্টি করেছেন আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। তিনিই তাকে সৃষ্টি করেছেন, অবকাশ দিয়েছে, কুমন্ত্রণা দেয়ার ক্ষমতা দান করেছেন। কিন্তু এতটুকু ক্ষমতা দেননি যে, মানুষ তাকে কুপোকাত করতে পারবে না। কুরআন মাজীদে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

'নিশ্চয় শয়তানের ষড়যন্ত্র নিতান্ত দুর্বল।'

এত দুর্বল যে, কেউ যদি তার সামনে বেঁকে বসতে পারে, তাহলে সে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শয়তান তাদের ওপরই বীরত্ব ও কর্তৃত্ব দেখায় যারা বুযদিল,

হৃদয় প্রাচুর্যহীন এবং গুনাহর প্রতি উদাস ও উত্তেজনামুখর। তবে গুনাহর উষ্ণ-আহ্বানে যারা মাথা এলিয়ে দেয়, তাদের জন্যও আল্লাহ তাওবার ব্যবস্থা রেখেছেন। এ তাওবার ধাক্কাও অত্যন্ত জোরালো, শয়তান এর সামনেও টিকে ওঠতে পারে না। কোনোভাবে গুনাহ করবে না– এমন দৃঢ়চেতা গুনাহ বর্জনকারীর দৃঢ়তা এবং গুনাহ হয়ে যায়– এমন দুর্বল মানুষের তাওবার সামনে শয়তানের ষড়যন্ত্র একেবারে দুর্বল ও ভঙ্গুর।

উত্তম গুনাহগার হও

এজন্যই এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন–

كُلُّكُمْ خَطَّاءُوْنَ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ (ترمذى، باب صفة القيامة)

তোমাদের প্রত্যেকেই ভুল করে। এখানে خطاء শব্দের অর্থ– বারবার ভুলকারী। সাধারণ ভুলকারী خاطى বলা হয়। সুতরাং মর্মার্থ দাঁড়ালো, তোমাদের প্রত্যেকেই বারবার ভুল করে, তবে এসব ভুলের জগতের বাসিন্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো, ওই ব্যক্তি যে তাওবা করে।

এ হাদীসের মাধ্যমে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোভ-লাভঘেরা এ পার্থিব জগতের মানুষ গুনাহর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করাটাই স্বাভাবিক। তবে এ আকর্ষণ যেন তাকে গুনাহ পর্যন্ত না নিতে পারে। এজন্য গুনাহর হাতছানি যখন দেখবে, তখনই শক্ত হয়ে যাবে যে, না, গুনাহ করবো না। এরপরেও হয়ত গুনাহ হয়ে যেতে পারে। তখন কাজ হলো বারবার তাওবা করবে। এখানে تائب তথা 'তাওবাকারী' না বলে বলা হয়েছে تواب তথা বারবার তাওবাকারী। বুঝা গেলো, একবার তাওবা করলে চলবে না, বরং যতবার গুনাহ হবে ততবার তাওবা করবে। এভাবে তাওবার আধিক্য বেশি হলে এর ধারালো শক্তি শয়তানকে দুর্বল ও করুণ করে ছাড়বে।

আল্লাহর রহমত একশ' ভাগ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : جَعَلَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِاْةَ جُزْءٍ فَاَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ،

وَاَنْزَلَ فِی الْاَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا ذَالِكَ لَجُزْءُ يَتَرَاحَمْ لِخَلَائِقِ حَتّٰى تَرْفَعَ لِدَابَّتِهٖ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً اَنْ تُصِيْبَهُ (صحيح مسلم، كتاب التوبة)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা যে রহমত সৃষ্টি করেছেন, তা একশ' ভাগে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে মাত্র এক ভাগ রহমত এ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যার কারণে মানুষ একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করে। যেমন পিতা ছেলেকে স্নেহ করে অথবা মা তার সন্তানদেরকে ভালোবাসে, ভাই ভাইয়ের সঙ্গে আন্তরিকতা দেখায়, ভাই বোনকে মমতা দেখায় কিংবা বন্ধু বন্ধুকে মহব্বত করে। মোটকথা দুনিয়ার সব রকম স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা শুধু ওই এক ভাগ রহমতেরই ফল। এমনকি এ কারণেই ঘোড়ার বাচ্চা যখন দুধ পান করতে আসে, তখন সে নিজের পা-টি আলগা করে দেয়। আর নিরানব্বই রহমত আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। এগুলো তিনি বান্দাদের ওপর আখেরাতে প্রকাশ ঘটাবেন।

এমন সত্তা থেকে নিরাশ হও কিভাবে?

আলোচ্য হাদীসটির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদেরকে আল্লাহর রহমতের নিঃসীম বিশালতা বুঝাতে চেয়েছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি আমাদের চেতনাকে শাণিত করেছেন যে, তোমরা এমন মহামহিম সত্তা থেকে নিরাশ হতে পার কিভাবে, যে সত্তা এমন অনবদ্য রহমত রেখে দিয়েছেন শুধু আমাদের পরকালীন জীবনের জন্য? অসীম রহমতের আধার যিনি সেই সত্তা সম্পর্কেও তোমাদের মনে এত নিরাশা? সুতরাং চিন্তা নয়, হতাশ নয়, বরং তাঁর অসীম রহমতকে তোমাদের দিকে টেনে আনো। আর এর পদ্ধতি হলো, তাওবা কর, ইসতেগফার কর, গুনাহগুলো ছেড়ে দাও, আল্লাহর দিকে ফিরে যাও। যত বেশি এগুলো করবে, আল্লাহর রহমত ততোধিক গতিতে তোমাদের দিকে ছুটে আসবে।

শুধু আশা যথেষ্ট নয়

আল্লাহর অসীম রহমত থেকে ফায়দা নিতে পারে কেবল সে ব্যক্তি যে আসলে ফায়দাপ্রার্থী। কেউ যদি তাঁর রহমত থেকে ফায়দা নিতে চায়, জীবনটা গাফলতের চাদরে ঢেকে রাখে, আর কামনা করে যে, তিনি তো ক্ষমাশীল,

দয়াবান– তাহলে তার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের হাদীস শুনে রাখুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন–

اَلْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ (ترمذى، باب صفة القيامة)

যে নফসের কামনা-বাসনার পেছনে ছুটে বেড়ায় আর আল্লাহর কাছে আশাবাদী হয়– সে অক্ষম, অসফল। হ্যাঁ, রহমতের আশা করার পাশাপাশি যে ব্যক্তি সেমতে কাজ করবে, চেষ্টা করবে, তাহলে 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহর রহমত তাকে আলিঙ্গন করবে।

বিস্ময়কর একটি ঘটনা

এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.)। তাঁর ভাষায়– একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদেরকে অতীত উম্মতের এক ব্যক্তি সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। লোকটি ছিলো জঘন্যতর গুনাহগার। পাপ-পঙ্কিলতায় থৈ থৈ করা জীবন ছিলো তার। একদিন তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলো। মৃত্যুর পূর্বে সে পরিবারের কাছে একটি অসিয়ত করলো যে, আমার সম্পর্কে তো তোমরা জানো। জীবনটা গুনাহর সাগরে কাটিয়ে দিয়েছি। নেক আমল বলতে কিছু নেই বললেই চলে। এখন আমাকে ভয়ে ধরে গেছে। তাই এক কাজ করবে, আমি যখন মারা যাবো, তখন আমার লাশটা পুড়ে ছাই করে ফেলবে। ছাইগুলোকে আবার মিহি করে পিষে ফেলবে। তারপর সেগুলো এখানে-সেখানে বাতাসের তীব্রতার মাঝে এমনভাবে উড়িয়ে দিবে যে, যেই ছাইগুলো দূর-দূরান্তে চলে যায়। তোমাদেরকে এ জাতীয় অসিয়ত কেন করছি জানো? কারণ, যদি আল্লাহর হাতে আমি পড়ে যাই, তাহলে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দিবেন, যে শাস্তি দুনিয়ার অন্য কেউ পাবে না। আমার গুনাহগুলোর অনিবার্য ফল তো এমনই হওয়া উচিত।

তারপর যখন সে মারা গেলো, পরিবারের লোকেরা তার অসিয়ত মতোই কাজ করলো। এতো ছিলো তার নির্বুদ্ধিতা যে, সে ভেবেছিলো, এত দূর-দূরান্তে ছিটিয়ে থাকা ছাইগুলো আল্লাহ তাআলা হয়ত একসাথে করতে পারবেন না। তার এ ধারণাটা ছিলো সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, এরপর আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিলেন, ছাইগুলো একত্র হয়ে যাও এবং যেমন ছিলে, শরীর-প্রাণে পুনরায় তেমনি হয়ে যাও। ফলে সে জীবিত হয়ে গেলো। আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার পরিবারকে এ জাতীয় অসিয়ত কেন করলে? সে উত্তর দিলো–

خَشْيَتَكَ يَا رَبِّ

'হে রব! আপনার ভয়ে।'

কারণ, জীবনে আমি অনেক গুনাহ করেছিলাম। ফলে আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, আপনার আযাব আমাকে পাকড়াও করে নিবে। আর আপনার আযাব তো খুবই কঠিন। এ আযাবের ভয়ে আমি এমনটি করেছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার ভয়ে তুমি এরূপ করেছিলে; তাহলে যাও, তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাওবাহ)

একটু চিন্তা করুন, লোকটির অসিয়ত কত নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ছিলো। বরং একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, তার এ কাজটি ছিলো কুফরী কাজ। কারণ, তার ধারণা ছিলো, সে যদি আল্লাহর হাতে পড়ে যায়, তাহলে তিনি কঠিন শাস্তি দিবেন। নাউযুবিল্লাহ। এ ধরনের আকীদা তো কুফরী-শিরকী আকীদা। যেন তার ধারণা, আল্লাহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছাইগুলো এত দূর-দূরান্ত থেকে একত্র করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ যখন তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তখন সে উত্তর দিলো, এর কারণ ছিলো– আপনার ভয়।

আর এ উত্তরেই আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন। কারণ, মূলত এ ব্যক্তি কৃত গুনাহগুলোর ওপর অনুতপ্ত হয়েছিলো, লজ্জিত হয়েছিলো, মৃত্যুর পূর্বে এজন্য অনুশোচনাও প্রকাশ করেছিলো। তাই আল্লাহ তাকে মাফ করে দিয়েছেন।

উক্ত ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কেন বর্ণনা করলেন? এটি বর্ণনার দ্বারা তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহর রহমত বান্দার কাছে শুধু একটা জিনিস দাবি করে। তাহলো, কৃত গুনাহের ওপর নির্ভেজাল অনুশোচনা প্রকাশ করবে, অনুতপ্ত হবে, লজ্জিত হবে, তাওবা করবে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে দেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক অর্থে কৃত গুনাহগুলোর ওপর লজ্জিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। তাওবা করার তাওফীক দান করুন। আমাদের সকলকে তিনি দয়া করে মাফ করে দিন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"বর্তমানে মানুষ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যার কারণে সঠিক কথাটাও তারা আজ শুনতে রাজি নয়। অভিযোগ নয় বরং অন্তরের ব্যথা থেকে বাস্তব কথাটা বলে দিলাম। একে অপরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে কোনো ফায়দা নেই। একটু চোখ-কান খুলে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের সঠিক পন্থা কোনটি? তাহলে বাস্তব বিষয়টি দিবালোকের মতো ঝলমলিয়ে উঠবে।"

দরূদ শরীফের ফযীলত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

হামদ ও সালাতের পর!

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

'আল্লাহ নবীর প্রতি দরূদ পাঠ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য দরূদ পাঠ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য দরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।" (সূরা আহযাব : ৫৬)

হাদীস শরীফে এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

بِحَسْبِ الْمُؤْمِنُ مِنَ الْبُخْلِ اِذَا ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

(كتاب الزهد لابن مبارك : ٣٦٣)

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, এ আয়াতে আমাদেরকে দু'টি বিষয়ের শিক্ষা দেয়া হয়েছে– সালাম ও দরূদ। সালাম কিভাবে দিতে হয়, এটা আমরা জানি। কিন্তু আপনার ওপর দরূদ পাঠ করার পদ্ধতি তো আমরা জানি না। এটা কিভাবে করতে হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, তোমরা এভাবে দরূদ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠান।'

এ বাক্যের মাধ্যমে বান্দার অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেন সে মনে করে, আমার যোগ্যতা-ইবা কতটুকু যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে দরূদ পড়বো। তাই নিজের অক্ষমতা সর্বপ্রথম স্বীকার করে নিচ্ছি এবং এ প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ! আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরূদ প্রেরণ করুন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) শান সম্পর্কে সবচে' ভালো জানেন কে?

কবি গালিব যদিও চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু মাঝে-মধ্যে এমন সব কবিতা বলতেন, হতে পারে আল্লাহ তাঁকে এজন্য মাফ করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে তাঁর একটি চমৎকার কবিতা রয়েছে–

غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گزاشتم

کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است (صلی اللہ علیہ وسلم)

'গালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছে। কারণ, আমরা প্রশংসাকে যত ফেনায়িত করি না কেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহের মোকাবিলায় তা দশ ভাগের এক ভাগও হবে না। এটা শুধু আল্লাহ তাআলার পক্ষে সম্ভব। কারণ, আল্লাহই সবচে' বেশি জানেন, তাঁর রাসূলের অনুপম গুণ ও মর্যাদা সম্পর্কে। তাই আমরা দরূদের মাধ্যমে বিষয়টি তাঁর ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনিই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ প্রেরণ করুন।

শতভাগ নিশ্চিত কবুলযোগ্য দু'আ

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, পৃথিবীতে এমন কোনো দু'আ নেই যে, কবুল হওয়ার ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চয়তা দেয়া যেতে পারে। বুকে হাত দিয়ে কেউই এ দাবি করতে পারবে না যে, তার দু'আ নিশ্চিত কবুল হয়ে গেছে। কিন্তু দরূদ শরীফ এমন এক দু'আ, যা কবুল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশও নেই। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ মানুষের দরূদের পূর্বেই দরূদ পাঠান। সুতরাং তা তো কবুল হয়েছেই। সুতরাং কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহের সুযোগ তো আর নেই।

দু'আ করার আদব

তাই বুযুর্গানে দ্বীন আমাদেরকে দু'আ করার আদব শিখিয়েছেন। যখন তোমরা কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দু'আ করবে, তখন দু'আর শুরুতে ও শেষে দরূদ পড়ে নিবে। কারণ, দরূদ কবুল হয়, এটা নিশ্চিত। আর আল্লাহর শান এটা নয় যে, আগে ও পরে কবুল হবে, মাঝখানের দু'আ কবুল হবে না। তাই দু'আর আদব হলো, প্রথমে আল্লাহর হামদ-সানা, তারপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ, এরপর নিজের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দু'আ করা।

দরূদ পাঠের সাওয়াব

হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর রহমত নাযিল করবেন দশবার। অন্য হাদীসে এসেছে, দরূদ পাঠকারীর দশটি গুনাহ মাফ হয়, দশটি স্তর উন্নীত হয়। (নাসায়ী শরীফ)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনপদ থেকে বের হয়ে খেজুর বাগানে ঢুকলেন এবং সিজদায় পড়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমার কথার প্রয়োজন ছিলো, তাই আমি অপেক্ষারত হয়ে বসে থাকলাম। কিন্তু তিনি সিজদা এত দীর্ঘ করলেন যে, আমি বিচলিত হলাম– রাসূলের প্রাণ উড়ে যায়নি তো! তাই তাঁর হাত নাড়িয়ে দেখতে চাইলাম। এভাবে অনেক সময় পার হয়ে গেলো। অবশেষে তিনি সিজদা থেকে ওঠলেন এবং দীপ্তিময় একটা ঝলক তাঁর চেহারায় খেলা করে গেলো। আমি বলে ওঠলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনি এত দীর্ঘ সিজদা করেছেন, যা ইতোপূর্বে আমরা আর দেখিনি। এমনকি আমি বিচলিত হয়েছি যে, আপনার প্রাণ চলে যায়নি তো! এ দীর্ঘ সিজদার কারণ কি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, এর কারণ হলো, জিবরাঈল (আ.) এসেছেন এবং আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করবেন। যে আমাকে সালাম পাঠাবে, আল্লাহ তাকে সালাম পাঠাবেন। এরই কৃতজ্ঞতায় আমি আজ সিজদার মাধ্যমে তাঁর দরবারে নেতিয়ে পড়েছি।

ফযীলতসমূহের নির্যাস

দরূদের মধ্যে যিকির রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ রয়েছে, রয়েছে দু'আর ফযীলত। অসংখ্য ফযীলতের এক মিলনস্থলের নাম হলো দরূদ শরীফ। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে এসব ফযীলত লুফে নিবে না, সে কৃপণই বটে। যেমন হাদীস শরীফেও বলা হয়েছে, এসব ব্যক্তি কৃপণই।

যে ব্যক্তি দরূদ পাঠ করে না

একবারের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে আসলেন। মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে বলে ওঠলেন, আমীন। দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখার সময়ও বললেন, আমীন। তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন, তখনও বললেন, আমীন। খুতবা শেষে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আমি যেইমাত্র মিম্বরে পা রেখেছি, তখনই জিবরাঈল (আ.) আসলেন। তিনটি দু'আ করলেন। প্রতিটি দু'আর পর আমি বলেছি, আমীন। মূলত এগুলো দু'আ ছিলো না, ছিলো বদদু'আ।

একটু ভাবুন, মসজিদে নববীর মতো পবিত্র স্থানে, সম্ভবত জুমুআর দিনে, যে দিনটি হলো, দু'আ কবুলের দিন, দু'আ করলেন জিবরাঈল (আ.) আর 'আমীন' বললেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এতগুলো বিষয় যেখানে পাওয়া গিয়েছে, সেখানে দু'আ কবুল যে হয়েছে, এর মধ্যে আর কী সন্দেহ থাকতে পারে।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রথম দু'আটি ছিলো এই– ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে তার পিতা-মাতাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথচ খেদমত করে গুনাহ মাফ ও জান্নাত লাভে ধন্য হতে পারলো না।

দ্বিতীয় বদদু'আ ছিলো, ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে পূর্ণ একটি রমযান অতিবাহিত করলো, অথচ গুনাহ মাফ করাতে পারলো না। যেহেতু রমযান মাসে মহান আল্লাহ গুনাহ মাফের জন্য খুঁজে খুঁজে নেন।

তৃতীয় বদদু'আ হলো, ওই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস, যে আমার নাম শুনেছে, অথচ আমার ওপর দরূদ পাঠ করলো না।

এ হলো, দরূদ শরীফ না পড়ার পরিণতি। তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আসার সঙ্গে সঙ্গে দরূদ পড়ে নিবেন।

(আত-তারিখুল কবীর, ইমাম বুখারী রচিত ৭/২২০)

সংক্ষিপ্ত দরূদ শরীফ

পূর্ণাঙ্গ দরূদ তো হলো, দরূদে ইবরাহীমী। যে দরূদ নামাযে পড়া হয়। যদিও দরূদের ভাষা কেবল এটাই নয়, তবুও উলামায়ে কেরাম সবাই ঐক্যমত যে, দরূদে ইবরাহীমী হলো, সর্বোত্তম দরূদ। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকেও এ দরূদ শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু দরূদে ইবরাহীমী পুরাটা বারবার পড়া একটু কষ্টকর, তাই সংক্ষিপ্ত দরূদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ও পড়ার অনুমতি অবশ্য রয়েছে। এটি সংক্ষিপ্ত হলেও দরূদ ও সালাম উভয়টাই এতে রয়েছে, তাই রাসূলুল্লাহর নাম শোনায় কমপক্ষে এতটুকু যে পড়বে, সেও ফযীলতের অধিকারী হবে।

صلعم অথবা শুধু ص লেখা জায়েয নেই

অনেকে রাসূলের নামের পর দরূদ লিখতে অলসতা দেখায় কিংবা সময় বেশি লাগবে অথবা কালি ফুরিয়ে যাবে মনে করে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর স্থলে صلعم অথবা শুধু ص লিখে দেয়। পার্থিব কাজের বেলায় সংক্ষিপ্তকরণের চিন্তা নেই, সংক্ষিপ্ততার সকল চিন্তা শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের বেলায় আসে। হতভাগা অথবা কৃপণ না হলে এরূপ করতে পারে না। কী এমন সমস্যা ছিলো صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ পুরাটা লিখে দিলে।

দরূদ শরীফ লেখার ফায়দা

হাদীস শরীফে এসেছে, মুখে একবার দরূদ পাঠ করলেন, আল্লাহর দশটি রহমত পাওয়া যায়, দশটি নেকীর অধিকারী হয় এবং তার আমলনামায় দশটি গুনাহ মাফের কথা লিপিবদ্ধ হয়। আর দরূদ লিখলেন যতদিন পর্যন্ত লেখাটি থাকবে, ততদিন ওই ব্যক্তির ওপর ফেরেশতারা অব্যাহতভাবে দরূদ পাঠ করবেন এবং যে ব্যক্তি এ লেখা পড়বে, তার সাওয়াবও লিপিবদ্ধকারী পাবে। অতএব, দরূদের মাঝে সংক্ষিপ্ত করা উচিত নয়।

মুহাদ্দিসগণ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা

ইলমে হাদীস ও সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চর্চার ফাযায়েল উল্লেখ করতে গিয়ে উলামায়ে কেরাম বলেছেন, শিক্ষাদাতা ও শিক্ষার্থী উভয় শ্রেণী বার বার দরূদ শরীফ পাঠের তাওফীক লাভে ধন্য হয়। কেননা, ইলম চর্চা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম তাদের সামনে বার বার আসে, আর প্রতিবারই صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এ সংক্ষিপ্ত দরূদটি পড়ে। এজন্যই বলা হয়েছে, মুহাদ্দিসগণ আল্লাহর সবচে' নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। যেহেতু অধিক হারে দরূদ পাঠের সৌভাগ্য তাঁদেরই হয়। এতই ফযীলত এ দরূদ শরীফের। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও তাওফীক দান করুন। আমীন।

ফেরেশতাগণ রহমতের প্রার্থনা করে

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فَلْيُقِلَّ عَبْدٌ مِنْ ذَالِكَ اَوْ لِيُكْثِرْ (ابن ماجة، باب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم)

হযরত আমির ইবনে রাবীআ (রাযি.) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার ওপর দরূদ পাঠ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পাঠ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্য রহমতের দু'আ পড়তে থাকে। যার ইচ্ছা ফেরেশতাদের রহমত নিতে পার, বেশি পার, কমও পার।

দশবার রহমত, দশবার শান্তি বর্ষণ

وَعَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشْرٰى يَرٰى فِيْ وَجْهِهٖ، فَقَال : اِنَّهُ جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ، فَقَالَ : اَمَا يُرْضِيْكَ يَا مُحَمَّدُ اَنْ لَا يُصَلِّيْ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا (سنن النسائى، باب فضل التسليم على النبى صلى الله عليه وسلم)

আবু তালহা (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন, যে অবস্থায় তাঁর চেহারায় আনন্দের আভা দেখা যাচ্ছিলো। এসেই বললেন, জিবরাঈল (আ.) আমার কাছে এসেছিলেন। বলে গেলেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আপনার সন্তুষ্টির জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আপনার উম্মতের কোনো ব্যক্তি একবার আপনার ওপর দরূদ পড়লে, আমি তার ওপর রহমত বর্ষণ করবো দশবার। আর একবার সালাম পেশ করলে, আমি তার প্রতি দশবার সালাম পেশ করবো।

দরূদ পৌছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ مِنْ اُمَّتِى السَّلَامَ (سنن النسائى، باب السلام على النبى صلى الله عليه وسلم)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর এমন অনেক ফেরেশতা রয়েছে, যারা পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়ায়। কোনো বান্দা যখন আমার প্রতি সালাম পেশ করে, তখন সেসব ফেরেশতা তা আমার কাছে পৌছিয়ে দেয়।

অপর হাদীসে এসেছে, 'বান্দা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করে, পাঠকারীর নামসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তা পেশ করা হয়। বলা হয়, আপনার উম্মতের অমুকের ছেলে অমুক আপনার খেদমতে দরূদের হাদিয়া পেশ করেছে।'

একেই বলে সৌভাগ্য। স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নাম পৌছে যাওয়ার মত সৌভাগ্য আর কী হতে পারে।

(কানযুল উম্মাল ২২১৮)

আমি নিজেই দরূদ শুনি

অপর একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আমার কোনো উম্মত দূর-দূরান্তে অবস্থান করা সত্ত্বেও আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, তখন ফেরেশতাগণ তা আমার নিকট পৌছিয়ে দেয়। আর যখন আমার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দরূদ পাঠ করে এবং বলে اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ তখন তাঁর দরূদ ও সালাম আমি নিজেই শুনি। (কানযুল উম্মাল ২১৬৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ বিশেষ এক পদ্ধতির জীবন দান করেছেন, তাই কবরের কাছে দরূদ পাঠাতে চাইলে اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ বলবে। এছাড়া সাধারণত দরূদে ইবরাহীমী পড়াটাই অধিক লাভজনক।

দুঃখ ও মুসীবতের সময় দরূদ শরীফ পাঠ করা

ডা. আবদুল হাই (রহ.) একবার বলেছেন, কেউ দুঃখ, বেদনা ও নিরানন্দে ক্লিষ্ট হলে এর জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ তো অবশ্যই করবে। তবে পাশাপাশি একটি কাজও করবে। বেশি বেশি করে দরূদ পড়তে থাকবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ সংশ্লিষ্ট মুসীবত দূর করে দিবেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দু'আ পাবে যেভাবে

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত মন্থন করলে পাওয়া যায়, কোনো ব্যক্তি তাঁর সমীপে হাদিয়া পেশ করলে তিনি চেষ্টা করতেন তাকে তার চেয়ে উত্তম হাদিয়া পেশ করার। এর মাধ্যমে পেশকৃত হাদিয়ার প্রতিদান দিয়ে দেয়া ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। আমলটি তিনি আজীবন করেছেন। আমাদের পাঠকৃত দরূদ শরীফও মূলত এক প্রকার হাদিয়া, যা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করি। আর হাদিয়ার প্রতিদানে আরও উত্তম হাদিয়া দেয়া যেহেতু তাঁর স্বভাব ছিলো, সুতরাং যখনই দরূদ পাঠকারী উম্মতের নামসহ তাঁর দরবারে পেশ করা হবে, তখনি এর চেয়ে উত্তম হাদিয়া তিনি দিবেন– এটাই স্বাভাবিক। আর প্রতিদানসুলভ এ হাদিয়ার পদ্ধতি হবে এটাই যে, তিনি ওই ব্যক্তির জন্য দু'আ করেন। তার দুঃখ, কষ্ট ও পেরেশানী দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাবেন। আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিনি, তিনি আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু মনের আকুতি তো হলো, তাঁর কাছে দু'আ চাওয়ার। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব। আর তাহলো, অধিকহারে দরূদ পাঠ করবে। এর উসিলায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর অংশীদার হবে এবং সকল পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। এ কারণেই অনেক বুযুর্গ এমন ছিলেন যে, অসুস্থ হলে দরূদ পাঠ শুরু করে দিতেন। তাই দিনে কমপক্ষে একশ' বার দরূদ পাঠ করা উচিত। দরূদে ইবরাহীমী পড়তে পারলে বেশি ভালো।

অন্যথায় নিম্নের দরূদটিও পড়া যেতে পারে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

আরো সংক্ষিপ্ত চাইলে اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ এটি পড়বে অথবা কমটপক্ষে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ পড়ে নিবে। তবুও একশ' বার অবশ্যই পড়বে। এর বরকতে 'ইনশাআল্লাহ' বহু সওয়াব অর্জিত হবে এবং আল্লাহর রহমতের অধিকারী হবে।

দরূদ শরীফের ভাষা ও শব্দ সম্পর্কে

দরূদ শরীফ একটি ইবাদত এবং এক প্রকার দু'আও বটে। আল্লাহর নির্দেশ এটি পালন করা হয়। সুতরাং দরূদ শরীফের ভাষা ও শব্দ তাই হওয়া উচিত, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত। উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। যেসব দরূদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, সেগুলো এক সঙ্গে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। যেমন হাফেজ সাখারী (রহ.) اَلْقَوْلُ الْبَدِيْعُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْحَبِيْبِ الشَّفِيْعِ এ বিষয়ে আরবী ভাষায় একটি কিতাব রচনা করেছেন, যেখানে প্রায় সকল দরূদই স্থান পেয়েছে। অনুরূপভাবে হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) زاد السعيد নামক একটি পুস্তিকা লিখেছেন, যেখানে তিনি ওই সকল শব্দ একত্র করেছেন, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত এবং তিনি এর ফযীলতের বর্ণনাও পুস্তিকাটিতে করেছেন।

মনগড়া দরূদ প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিভিন্ন ধরনের দরূদ শরীফ পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রমাণিত। এরপরেও মানুষ নিত্য নতুন দরূদের সন্ধানে থাকে। দরূদে তাজ, দরূদে লাকী ইত্যাদিসহ আরও কত বিচিত্রময় নামের দরূদ আমাদের মাঝে সমাজে প্রচলিত। এগুলো সব মনগড়া বর্ণনার চমকদার পসরা। এসব মনগড়া দরূদের কোনো কোনোটিতে এমন সব শব্দও রয়েছে, যেগুলো সম্পূর্ণ শরীয়ত পরিপন্থী বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিরকপূর্ণও। তাই এসব মনগড়া দরূদের ফযীলত যত ঝলমলেই হোক না কেন, এগুলো পরিহার করা উচিত এবং শুধু সেসব দরূদ পড়া উচিত, যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে সংকলিত। এ কারণেই উচিত হলো, হযরত থানবী (রহ.)-এর 'যাদুস সাঈদ' নামক দরূদের কিতাবটি সকলেরই ঘরে রাখা এবং এ অনুযায়ী আমল করা।

প্রিয়নবী (সা.)-এর পাদুকাদ্বয়ের নকশা এবং ফযীলত

থানবী (রহ.)-এর উক্ত পুস্তিকাতে আরেকটি বিষয় রয়েছে, যা অত্যন্ত ফলদায়ক। বুযুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়টির সত্যতা পাওয়া যায়। তাহলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুতা মুবারকের নকশা। কঠিন বিপদ মুহূর্তে কোনো ব্যক্তি নকশাটি বুকের ওপর রাখলে এর বরকতে আল্লাহ ওই ব্যক্তির বিপদ দূর করে দেন। তাই কিতাবটি সকলের কাছে থাকা উচিত। অনুরূপভাবে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.)-এর 'ফাযায়েলে দরূদ শরীফ' নামকক পুস্তিকাটিও প্রত্যেক ঘরে ঘরে থাকা প্রয়োজন।

দরূদ শরীফের বিধান

উম্মতের উলামায়ে কেরামের ঐক্যমত সমর্থিত বক্তব্য হলো জীবনে একবার দরূদ পড়া প্রত্যেকের দায়িত্ব। এটি ফরযে আইন। নামায, রোযা যেমন ফরয, তেমনি জীবনে একবার দরূদ পাঠ করাও ফরয। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

'আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর ওপর দরূদ পাঠান। হে মুমিনগণ! তোমরাও তার উপর দরূদ ও যথাযথভাবে সালাম পাঠাও।'

আর যদি এক মজলিসে বার বার দরূদ পড়া হয় বা শোনা হয়, তবে একবার পড়া ওয়াজিব। না পড়লে গুনাহগার হবে। অবশ্য বার বার পড়া উত্তম। বার বার না পড়লে কোনো ক্ষতি নেই।

ওয়াজিব এবং ফরযের মধ্যে পার্থক্য

আমলের দিক থেকে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। উভয়টির ওপরই আমল করা আবশ্যক। যেমনিভাবে ফরয ত্যাগকারী গুনাহগার হয়, অনুরূপভাবে ওয়াজিব ত্যাগকারীও। তবে উভয়ের মাঝে শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, ফরয অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যায়। যেমন, কেউ যদি বলে– নামায বলতে কোনো কিছু নেই, তবে সে কাফের হয়ে যাবে অথবা রোযাকে অস্বীকার করলেও কাফের হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ওয়াজিব অস্বীকার করলে কাফের হয় না ঠিক; কিন্তু কঠিন গুনাহগার হিসাবে অবশ্যই সাব্যস্ত হবে। আর তাকে বলা হবে, সে ফাসিক। যেমন কোনো ব্যক্তি বিতর নামাযকে অস্বীকার করলে কাফের হবে না ঠিক, তবে ফাসেক অবশ্যই হবে।

প্রতিবারই দরূদ শরীফ পড়া উচিত

এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা একাধিকবার পড়া হলে, শুধু একবার দরূদ শরীফ পড়া ওয়াজিব; প্রতিবার নয়। এ হলো, ইসলামের বিধান। তবে একজন মুসলমানের ঈমান কী দাবি করে? তার ঈমানের দাবি হলো, যতবার তাঁর আলোচনা আসবে, ততবার দরূদ পড়বে। এমনকি সংক্ষেপে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হলেও পড়বে।

অযুর সময় দরূদ শরীফ পড়া

এমন কিছু সময় রয়েছে, যখন দরূদ শরীফ পড়া মুস্তাহাব। যেমন, অযুর সময় একবার দরূদ পড়া মুস্তাহাব। বার বার পড়লে সাওয়াব পাবে। তাই বার বারই পড়া ভালো। একজন মুসলমান যতক্ষণ অযু করবে, ততক্ষণ দরূদ পাঠ করবে– এটাই হওয়া উচিত। উলামায়ে কেরাম বলেছেন, অযু চলাকালীন দরূদ পড়া মুস্তাহাব।

প্যারালাইসিস হলে দরূদ পড়া

হাদীস শরীফে এসেছে, কারো হাত-পা অবশ হয়ে গেলে এবং হাত-পায়ের অনুভূতি শক্তি চলে গেলে অর্থাৎ প্যারালাইসিস হলে সে যেন আমার প্রতি দরূদ পড়তে থাকে।

এ জাতীয় দরূদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ার কথা কেন বলেছেন? হতে পারে এটা এক প্রকার চিকিৎসা। আল্লাহর রহমত সঙ্গী হলে দরূদ শরীফের বরকতে এ রোগ নিরাময়ও হতে পারে। আমি বলবো, চিকিৎসা হোক বা না হোক, কিন্তু দরূদ পাঠের একটা পর্যাপ্ত সুযোগ তো হলো, সুতরাং গনীমত মনে করে সুযোগকে কাজে লাগাও। একজন মুসলমানের কাছে কাম্য মূলত এটাই।

মসজিদে প্রবেশকালে ও বের হওয়ার সময় দরূদ পাঠ করা

এই দুই সময়ে দরূদ শরীফ পড়া মুস্তাহাব। মসজিদে প্রবেশ করার সময়– اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ বলা সুন্নাত। আর বের হওয়ার সময় اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ পড়া সুন্নাত। উভয় দু'আর সঙ্গে بِسْمِ اللّٰهِ এবং দরূদ মিলিয়ে নেয়ার কথাও বিশুদ্ধ বর্ণনাতে এসেছে। সুতরাং মসজিদে প্রবেশের সময় এভাবে দু'আ পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

আর বের হওয়ার সময় পড়বে এভাবে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

বিস্ময়কর হেকমত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে উক্ত দু'আ দু'টি শিক্ষা দিয়েছেন। মসজিদে প্রবেশের সময় কামনা করবে 'রহমত'। আর বের হওয়ার সময় কামনা করবে 'ফযল'। দু'আ দু'টির মর্মার্থ এটাই। উলামায়ে কেরাম এর তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, কুরআন-হাদীসে সাধারণত 'রহমত' শব্দটি এসেছে, আখেরাতের নেয়ামতরাজি সম্পর্কে। পক্ষান্তরে 'ফযল' শব্দটি এসেছে, দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে। এজন্যই কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তথা আখিরাতের পথে পাড়ি জমালে তার জন্য দু'আ করা হয়– রাহিমাহুল্লাহু কিংবা রহমাতুল্লাহি আলাইহি। আর দুনিয়ার নেয়ামতরাজির যেমন টাকা-পয়সা, ব্যবসা-চাকুরি, ঘর-বাড়ি ইত্যাদিকে বলা হয় ফযলুল্লাহ। অতএব মসজিদে প্রবেশের সময় রহমতের জন্য দু'আ করার অর্থ হলো, হে আল্লাহ! আখেরাতের নেয়ামতসমূহের দরজা আমার জন্য উন্মুক্ত করে দিন এবং মসজিদে প্রবেশ করার পর ইবাদত, যিকির ইত্যাদিতে মশগুল থাকার তাওফীক দান করুন। যেন এর মাধ্যমে আপনার রহমতের দরজা উন্মোচিত হয় এবং আখেরাতের নেয়ামতসমূহের অধিকারী হওয়া যায়।

পক্ষান্তরে বের হওয়ার সময় 'ফযল' এর জন্য দু'আ করার অর্থ হলো, একজন মানুষ সাধারণত মসজিদ থেকে বের হয়ে ঘর-বাড়ি, চাকুরি-বাকরি কিংবা অন্য কোনো কর্মক্ষেত্রে যায়। অতএব তখন এ দু'আ করার মর্মার্থ হলো, দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের প্রার্থনা করা।

একটু ভাবুন! যদি এ দু'টি মাত্র দু'আ আল্লাহ কবুল করে নেন, তাহলে তার আর কোন জিনিস প্রয়োজন থাকে? আখেরাতের রহমত, দুনিয়ার ফযল ভাগ্যে জুটে যাওয়ার চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে? এমন তাৎপর্যপূর্ণ দু'আ যখন করবে, তখন এর শুরুতে দরূদ শরীফ পড়ে নিবে। কেননা, দরূদ তো আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন। আর দরূদের সঙ্গে এ দু'আ দু'টিও কবুল হবে– এটাই যুক্তিযুক্ত। এ দু'আদ্বয় কবুল হলে নিশ্চয় তার সব প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাবে। এরপর আর কী চাই।

গুরুত্বপূর্ণ কথার পূর্বে দরূদ শরীফ পড়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ কথা বা কাজের শুরুতে হামদ ও সানা পড়ে নিবে। তারপর আমার প্রতি দরূদ পাঠিয়ে

দিবে।' এজন্যই দেখা যায়, যে কোনো আলোচনার শুরুতে উলামায়ে কেরাম সাধারণত এ হাদীসের ওপর আমল করেন। একান্ত সময় যদি কম হয়, তাহলেও কমপক্ষে نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ 'আমরা আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠাচ্ছি।' এতটুকু পড়ে নেন অথবা অনেক সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى এটি পড়েন। এটাও সংক্ষিপ্ত দরূদের একটা পদ্ধতি। শুধু ওয়াজ কিংবা আলোচনার শুরুতে নয়; বরং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কথা ও কাজের শুরুতেই দরূদ পড়া চাই। আমাদের মাঝে শুধু ওয়াজ-নসীহতের শুরুতে এর প্রচলন আছে। আর সাহাবায়ে কেরামের আমল ছিলো, যে কোনো কাজের শুরুতে এমনকি বেচাকেনা, লেনদেন ও বিবাহ প্রস্তাবের শুরুতেও তাঁরা এর ওপর আমল করতেন। আরবদের মাঝে এখনও এর ছিঁটেফোটা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এ সুন্নাত অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সুন্নাতটি এখন পুনর্জীবিত করা জরুরী।

ক্রোধ সংবরণে দরূদ শরীফ

আমাদের মাঝে অবশ্য এর প্রচলন নেই। আরবদের মাঝে আছে। দু' ব্যক্তিকে ঝগড়ায় লিপ্ত দেখলে তৃতীয় ব্যক্তি বলে ওঠে صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়'। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঝগড়ারত ব্যক্তির কোনো একজন কিংবা উভয়জন দরূদ পড়া শুরু করে। এতে উভয়ে রাগ পড়ে যায় এবং ঝগড়াও মিটমাট হয়ে যায়। মূলত এটাই হলো, উলামায়ে কেরামের শিক্ষা। দরূদ পাঠে গোস্বা চলে যাওয়ার কথা উলামায়ে কেরাম অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন। তাই এর ওপর আমল করা প্রয়োজন।

শোয়ার পূর্বে দরূদ পড়া

উলামায়ে কেরাম আরো বলেছেন, শোয়ার পূর্বে মাসনূন দু'আগুলো পড়বে, এরপর ঘুম আসা পর্যন্ত দরূদ পড়তে থাকবে। আসলে এ কাজটি তেমন কঠিন নয়। একটু মনোযোগ দিলেই হয়। এর মাধ্যমে মানুষ শেষ কাজটি একটি উত্তম জিনিসের মাধ্যমে করার সুযোগ পায়। এ সুযোগ কাজে লাগানো উচিত।

প্রতিদিন তিনশ' বার দরূদ পাঠ করা

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এবং আরো কোনো বুযুর্গ এর ওপর আমল করেছেন। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) তাঁর মুরীদদেরকেও এর শিক্ষা

করা তো আযব সাহসিকতার পরিচয়। কারণ, আমরা কোথায় আর তিনি কোথায়? যিয়ারত যদি হয়েও যায়, তাহলে তাঁর মর্যাদা, অবস্থান, আদব ও হক কিভাবে আদায় করবো? তাই স্বতস্ফূর্তভাবে নিজে এত বড় সৌভাগ্যের আশা না করা উচিত। এ কারণে আমিও এত বড় তামান্না করতে পারি না। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ যদি দয়া করেন, তাহলে ভিন্ন কথা। তিনি একান্ত অনুগ্রহ করে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভে আমাদেরকে ধন্য করলে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওনা। খোদাপ্রদত্ত প্রাপ্তির মাঝে আদব রক্ষা করার তাওফীকও 'ইনশাআল্লাহ' হয়ে যাবে।

হযরত মুফতী সাহেব (রহ.) এবং পবিত্র রওজার যিয়ারত

আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) যখন পবিত্র রওজার যিয়ারতে যেতেন, তখন রওজার একেবারে রনিকটে যেতেন না। বরং সব সময় তিনি রওজার নিকটবর্তী যে খুঁটিটি আছে সেখানে কেউ দাঁড়ালে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেন। এ প্রসঙ্গে একদিন তিনি নিজেই বলেন, একদিন মনে মনে ভাবলাম, হয়তোবা আমি কঠিন হৃদয়ের মানুষ। অন্যথায় রওজার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি না কেন। এই যে আল্লাহর বান্দারা রওজার একেবারে জালি ছুঁয়ে ধরার চেষ্টা করছে, আমি এ ধরনের কিছু করি না কেন। রওজার যত কাছে যাওয়া যায় ততই তো সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমি কী করবো, আমার কদম যে ওঠতে চায় না। উক্ত চিন্তা যখনই আমার অন্তরে আসে, তখনই এই অনুভূতিতে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি যে, পবিত্র রওজা থেকে যেন আওয়াজ আসছে–

'একথা মানুষের কর্ণ কুহরে পৌঁছিয়ে দাও যে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত সমূহের ওপর আমল করে, সে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আমার নিকটেই আছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের কোনো তোয়াক্কা করে না, তার অবস্থান একেবারে কাছে হোক কিংবা দূরে প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে উভয়টিই সমান।'

উক্ত অনুভূতির মাঝে যেহেতু এ নির্দেশও আছে, 'মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দাও', তাই আব্বাজান তাঁর ওয়াজ ও আলোচনায় মানুষের সামনে এটা বর্ণনা করতেন। বরং বলতেন, পবিত্র রওজার এক যিয়ারতকারী বাস্তবেই এ আওয়াজ শুনেছে। তারপর একদিন বললেন, আসলে ঘটনাটি আমার সঙ্গেই হয়েছে।

সুন্নাতের অনুসরণই হলো প্রকৃত বিষয়

প্রকৃত বিষয় হলো, সুন্নাতের অনুসরণ। এটি জীবনের মাঝে বাস্তবায়িত হলে, তার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভ হয়ে গেলো।

'আল্লাহ না করুন', যদি নৈকট্য থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে মানুষ যতই রওজার নিকটে অবস্থান করুক না কেন, এমনকি যদি পবিত্র হুজরাতেও ঢুকে পড়ে, তবুও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য ভাগ্যে জুটবে না। আল্লাহ আমাদের ওপর দয়া করুন। তাঁর রাসূলের সুন্নাতের ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

দরূদ শরীফে নতুন পদ্ধতি

অধিকহারে দরূদ পাঠ অবশ্যই একটি ফযীলতপূর্ণ আমল। কিন্তু আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতলানো পদ্ধতি অনুসারে হওয়া। নিজের পক্ষ থেকে আমল করলে কিংবা নতুন কোনো পদ্ধতি আমলের মাঝে সংযোজন করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। দরূদের ব্যাপারে বর্তমানে মানুষ মনগড়া পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখা যায় এবং মনে করে, এটা ভালো কাজ। এর মাধ্যমে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত প্রকাশ করে, আসলে মনগড়া পদ্ধতি কখনই গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় কোনো ফলাফল দেখা যায় না।

মনগড়া পদ্ধতি বিদআত

যেমন অনেকে যেন দরূদ পড়ে না; বরং প্রদর্শনী দেখায়। সকলে মিলে মাইকে কিংবা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সমস্বরে শুরু করে দেয়–

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

আর মনে করে, দরূদ-সালামের পদ্ধতি এটাই এবং নির্জনে বসে দরূদ-সালাম পেশ করা তারা সঠিক মনে করে না। অথচ এদের এ জাতীয় পদ্ধতি সম্পূর্ণ মনগড়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ জীবনীতে কিংবা সাহাবায়ে কেরামের জীবনেতিহাসে এ ধরনের পদ্ধতির কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কেরামই তো হলেন খাঁটি নমুনা, যারা সকাল-সন্ধ্যায় দরূদ পাঠে রত থাকতেন। সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তি তাদের মনগড়া পদ্ধতি মতে না চললে তার ঘাড়ে দোষ চাঁপিয়ে দেয়া হয় যে, এ ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মহব্বত রাখে না এবং দরূদকে স্বীকার করে না ইত্যাদি। আরো বলে, এ দরূদ থেকে উত্তম দরূদ আর নেই। ভালো করে বুঝে নিন, তাদের এসব অভিযোগ সম্পূর্ণ বাজে ও ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে যে নিয়ম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দিয়ে গেছেন, তার চেয়ে উত্তম কোনো পদ্ধতি আর থাকতে পারে না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত উত্তম

পদ্ধতি হলো, এক সাহাবী তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেছেন যে, আপনার ওপর দরূদ পাঠের পদ্ধতি কী? উত্তরে তিনি বলেছেন, দরূদে ইবরাহীমী পড়।

নামাযে দরূদ পাঠের পদ্ধতি

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলা দরূদ শরীফকে নামাযের অংশ বানিয়েছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নামাযের মধ্যে সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরা বা আয়াত তেলাওয়াত দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় করা হয়। আর দরূদ শরীফের ব্যাপারে নিয়ম হলো, তাশাহহুদের পরে বসা অবস্থায় পড়তে হয়। এর দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, এ দরূদ দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে মোটকথা সর্বাবস্থায় পড়া জায়েয আছে। এর জন্য কোনো একটি পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে ফেলা এবং এ দাবি করা যে, এটাই উত্তম পদ্ধতি– সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও গলদ।

দরূদ চলাকালে রাসূলুল্লাহ (সা.) আগমন করেন কিনা?

দাঁড়িয়ে দরূদ পাঠ মারাত্মক ভুল তখনই হয়, যখন এর সঙ্গে ভুল বিশ্বাস যুক্ত হয়। অর্থাৎ এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা যে, দরূদ পাঠকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা তাঁর পবিত্র রূহ পাঠকারীর কাছে চলে আসে, তাই তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতে হয়। এ ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দরূদ পাঠকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসেন– এ জাতীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস তারা কোত্থেকে পেলো– কুরআনের আয়াত থেকে, না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে, না সাহাবায়ে কেরামের বাণী থেকে? এ জাতীয় কথা তো কোথাও নেই, তাহলে এরা কোত্থেকে পেলো? আমার বক্তব্যের সত্যতা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে হাদীসটি আমি শুনিয়েছি, তার মাধ্যমে। যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى مَلَآئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنَ مِنْ اُمَّتِىْ السَّلَامَ

লক্ষ্য করুন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটিতে একথা বলা হয়নি যে, দরূদ পাঠকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেন। বরং বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার কিছু ফেরেশতা রয়েছে, যারা গোটা পৃথিবীতে ঘোরাফেরা করে। তাদের দায়িত্ব হলো, কেউ আমার ওপর দরূদ-সালাম পাঠ করলে আমার কাছে তা পৌছিয়ে দেয়া।

হাদিয়া দেয়ার আদব

একটু চিন্তা করুন, এ দরূদ শরীফ কী? এতো এক প্রকার হাদিয়া কিংবা তোহফা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করা

হয়। বড় কাউকে হাদিয়া দিলে তাকে কি একথা বলা যায় যে, আপনি আমার বাড়িতে আসুন, আপনাকে হাদিয়া দেয়া হবে? না কি তার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়? বলা বাহুল্য, বড়'র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকলে এমন অসৌজন্যমূলক কথা মুখে আনাও সম্ভব হবে না যে, হে রাসূল! আপনি হাদিয়া গ্রহণের জন্য আমার বাড়িতে আসুন। বরং তখন ভক্তি ও ভদ্রতার দাবি হলো, নিজে গিয়ে হাদিয়া পেশ করা কিংবা দূত মারফত হাদিয়া পাঠিয়ে দেয়া। এইজন্য আল্লাহও নিয়ম করে রেখেছেন যে, উম্মতের কেউ দরূদের হাদিয়া পেশ করলে, নির্ধারিত ফেরেশতা তা পৌঁছিয়ে দিবে। আর ফেরেশতারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবেই পালন করেন। এমনকি দরূদ পাঠকারীর নাম ও পরিচয়সহ পবিত্র রওজায় পৌঁছিয়ে দেন।

এটি ভ্রান্ত বিশ্বাস

অথচ আমাদের কর্মপদ্ধতি আজ উক্ত আদবের সম্পূর্ণ বিপরীত। একটু চিন্তা করুন, আমরা দরূদের হাদিয়া পেশ করবো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদিয়া গ্রহণ করার জন্য আমাদের কাছে আসবেন, আর আমরা এর জন্য দাঁড়িয়ে যাবো– এটা সম্পূর্ণ উদ্ভট ধারণা নয় কি? এজন্য এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। মনগড়া পদ্ধতি অবলম্বনের অনুমোদন মোটেও দেয়া যেতে পারে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতলানো পদ্ধতিই গ্রহণ করতে হবে।

দরূদ নিম্নস্বরে ও আদবের সঙ্গে পাঠ করবে

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

'আল্লাহকে তোমরা বিনয়ের সঙ্গে এবং গোপনে ডাক।' (সূরা আরাফ : ৫৫)

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দু'আ, যিকির নিম্নস্বরে ও বিনয়ের সঙ্গে করাটাই উত্তম। অনুরূপভাবে দরূদের আমলও।

একটু ভাবুন

আজ মানুষ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যার কারণে মানুষ সঠিক কথাটাও আর শুনতে চায় না। অভিযোগ নয়; বরং অন্তরের ব্যথা থেকে বাস্তব কথাটা ব্যক্ত করলাম। একে-অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি দ্বারা কোনো ফায়দা নেই। একটু চোখ-কান খুলে বুঝবার চেষ্টা করুন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার পদ্ধতি ও দাবি কী? তাহলে বাস্তব বিষয়টি দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

তোমরা বধিরকে ডাকছো না

একবারের ঘটনা। কিছু সাহাবী কোথাও যাচ্ছিলেন এবং পথিমধ্যে উচ্চৈঃস্বরে যিকির ও দু'আ শুরু করে দিলেন। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন–

إِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا

অর্থাৎ 'তোমরা তো বধির কিংবা অনুপস্থিত কোনো সত্তাকে ডাকছ না।'

মহান আল্লাহ তো তোমাদের সকল সঙ্কেত, সংকল্প ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে জ্ঞাত। তাকে গলা ছেড়ে দিয়ে ডাকার দরকার নেই। নিম্নস্বরে ডাকলেও তিনি শোনেন, জানেন। সুতরাং বুঝা গেলো, এটাই হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো পদ্ধতি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ পদ্ধতিতে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"এই যে আমরা আজ যে দুর্দশার শিকার, বিশ্রী, বিরক্তিকর ও হতাশাপূর্ণ জীবন আজ আমাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এবং আল্লাহর গযব বিরামহীনভাবে আমাদের ওপর পতিত হচ্ছে— কেন এমনটি হচ্ছে? কেন আমাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু আজ নিরাপদ নয়। এর কারণ হলো, আমরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত তরীকা ছেড়ে বসেছি। বেচা-কেনা, লেন-দেনসহ সবকিছুতেই আমরা ধোঁকাবাজি করছি। মাপে কম দেয়া, ভেজাল মিশ্রিত করা এবং এ জাতীয় নানা প্রতারণার জালে আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। ফলে সমাজটা আজ নিরাপত্তাহীনতা ও অশান্তিতে করুণ ও কাতর হয়ে পড়েছে।"

প্রসঙ্গ : মাপে কম দেয়া এবং অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন করা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ - اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ - وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ - اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ - لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ - يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ - (سورة المطففين : ١-٦)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

হামদ ও সালাতের পর!

মাপে কম দেয়া একটি মারাত্মক গুনাহ

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী! আপনাদের সামনে আমি সূরা মুতাফফিফীন-এর শুরু দিকের আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলাম। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে একটি জঘন্য গুনাহর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তাহলো– মাপে কম দেয়ার গুনাহ। আরবী ভাষায় একে বলা হয়– তাতফীফ। এ 'তাতফীফ' শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং শব্দটির অর্থ আরো ব্যাপক। যে কোনো ব্যাপারে প্রাপককে প্রাপ্য থেকে কম দেয়াও 'তাতফীফ' এর অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতগুলোর মর্মার্থ

উল্লিখিত আয়াতগুলোর অর্থ এই– যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ। (আল্লাহ তাআলা এখানে وَيْلٌ শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ দুটি– দুর্ভোগ এবং মর্মন্তুদ শাস্তি। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই–) কঠিন শাস্তি তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয় তথা প্রাপককে তার প্রাপ্য থেকে কম দেয়। এরাই তারা, যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণমাত্রায় নেয় (এক আনাও নিয়ে নেয়)। আর যখন অন্য লোককে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয় (প্রাপককে তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য দেয় না)। (তারপর আল্লাহ বলেন–) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, সেই মহাদিবসে যেদিন সকল মানুষ বিশ্ব পালনকর্তার সামনে দাঁড়াবে? (সেদিন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র আমলও কেউ গোপন করে রাখতে পারবে না। সকলের আমলনামা চোখ ধাঁধিয়ে স্পষ্ট হয়ে যাবে। অতএব, তারা কি চিন্তা কে না যে, পার্থিব জগতের এ ক্ষুদ্র লোভ-লাভের কারণে তারা দোযখের শাস্তি ভোগ করবে? এ হলো মাপে কম দেয়ার শাস্তি। তাই কুরআন মাজীদ এ জঘন্য কাজ থেকে বারবার সতর্ক করেছে। হযরত শুআইব (আ.)-এর কওমের বর্ণনাও এ প্রসঙ্গে এসেছে)।

শুআইব (আ.)-এর জাতির অপরাধ

হযরত শুআইব (আ.) আল্লাহর এক প্রেরিত নবী। নিজ কওমের কাছে পাঠানো হয়েছিলো তাঁকে। তাঁর জাতি ছিলো একটি অকৃতজ্ঞ জাতি। কুফর, শিরক, মূর্তিপূজাসহ নানা অপরাধে তারা নিমগ্ন ছিলো। এছাড়াও একটি অপরাধ তাদের মাঝে ব্যাপক ছিলো। তাহলো তারা মাপে কম দিতো। এ ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট দুর্নাম ছিলো। আরেকটি অপরাধও তারা করতো। তাহলো পথচারীদের মালামাল লুটপাট করে খেয়ে ফেলতো। হযরত শুআইব (আ.) তাদেরকে বুঝালেন। কুফর ও শিরক থেকে সতর্ক করলেন। তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানালেন। ওজনে কম না দেয়ার এবং পথচারীকে নিরাপদে সফর করতে দেয়ারও নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর জাতি ছিলো নিজেদের কুকর্মে অটল, তারা শুআইব (আ.)-এর এসব দরদমাখা কথার কোনো পাত্তা দিলো না, বরং বললো–

أَصَلَوٰتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ أَوْ أَنْ نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا

'আপনার নামায কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা ওইসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দিই, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যার পূজা করে আসছে; আর আমাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার অধিকারী না থাকি? কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম– সবই কি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে করতে হবে।' (সূরা হুদ : ৮৭)

হযরত শুআইব (আ.) তাদেরকে যতই বুঝালেন, কোনো কাজ হলো না। দুর্ভাগ্য তার জাতির। অবশেষে তা-ই ঘটলো, যা নবীদের কথা অমান্য করলে ঘটে থাকে।

শুআইব (আ.)-এর জাতি ও শাস্তি

আল্লাহ তাআলা শুআইব (আ.)-এর জাতির ওপর, তীব্র গরম চাপিয়ে দিলেন। তিন দিন পর্যন্ত এ শাস্তি অব্যাহত থাকলো। সে এক অসহনীয় জ্বালা। আসমান থেকে যেন আগুন পড়ছিলো, আর যমীন থেকে যেন আগুন উগলে বের হচ্ছিলো। ফলে তার ঘরের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেতো না। তিন দিন পর হঠাৎ সেই জনপদের ওপর ঘাড় মেঘ দেখা দিলো। এ মেঘের নিচে সুশীতল বায়ু ছিলো। গরমে অস্থির জাতি দৌড়ে দৌড়ে এ মেঘের নিচে জমায়েত হয়ে গেলো, তখন মেঘমালা তাদের ওপর পানির পরিবর্তে আগুন নিক্ষেপ শুরু করলো। ফলে সবাই ছাই-ভস্ম হয়ে গেলো। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ

'তারপর তারা শুআইব (আ.)কে মিথ্যাবাদী বললো, ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করলো।' (সূরা শুআরা : ১৮৯)

অন্যত্র তিনি বলেছেন–

فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا وَّكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ

'আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন যাপনে মদমত্ত ছিলো। এগুলোই এখন তাদের ঘর-বাড়ি, তাদের পর এগুলোতে মানুষ সামান্যই বাস করছে। অবশেষে আমিই মালিক রয়েছি।' (সূরা কাসাস : ৫৮)

যে ব্যক্তি ওজনে কম দেয়, সে তো মনে করে, এর দ্বারা আমার সম্পদ বাড়ছে। অথচ এগুলো কিছুই তো তার কাজে আসবে না।

এটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

ডান্ডা মেরে এক ছটাক, দুই ছটাক কিংবা এক তোলা, দুই তোলা হয়ত মেরে দিয়েছো, এর দ্বারা কয়েকটা পয়সা তোমার ঝুলিতে হয়ত জুটেছে, মূলত এটা পয়সা নয়, বরং আগুনের স্ফুলিঙ্গ। তোমার পেটে এ পয়সার কেনা মাল ঢুকাচ্ছো না বরং অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঢুকাচ্ছ। হারাম মাল এবং তার ভক্ষণকারী সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

'যারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্ত্বরই তারা আগুনে প্রবেশ করবে।' (সূরা নিসা : ১০)

ইবাদতেও 'তাতফীফ' রয়েছে

ওজনে কম দেয়া ইবাদতের মধ্যেও রয়েছে। কেননা, শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। যেমন তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) সূরা মুতাফফিফীনের প্রথম আয়াতগুলোর তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন–

شِدَّةُ الْعَذَابِ يَوْمَئِذٍ لِلْمُطَفِّفِيْنَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ (تنوير المقباس من تفسير ابن عباس)

অর্থাৎ– যারা নিজেদের নামায, যাকাত ও রোযা ইত্যাদিতে কম করে তথা ক্রটি করে, তাদের জন্যও রয়েছে কঠোর শাস্তি। আখেরাতে এদেরকেও ওজনে কম দেয়ার অপরাধে পাকড়াও করা হবে।

শ্রমিকের বিনিময় সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিবে

অথবা মনে করুন, কোনো মালিক তার চাকরকে খুব খাটায়। আরামের সামান্য সুযোগও চাকরকে সে দেয় না। কিন্তু বেতন দেয়ার সময় তার চোখ কপালে ওঠে যায়। গড়িমসি করে, যেন কলজেটা তার ছিঁড়ে যায় অথবা দেয় ঠিক, তবে সময় মতো দেয় না; বরং নিজের ইচ্ছে মতো দেয়, তাহলে এটাও ওজনে কম দেয়ার শামিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (ابن ماجه، ابواب الاحكام، رقم الحديث ٢٤٦٨)

অর্থাৎ– শ্রমিকের পারিশ্রমিক তাকে দিয়ে দাও, তার ঘাম শুকানোর পূর্বেই।

চাকর-বাকরের খানা কেমন হবে?

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেছেন, আপনি হয়ত একজন চাকর রেখেছেন এবং তার ব্যাপারে নির্দিষ্ট বেতন আর দু'বেলা খানা দেয়ার সিদ্ধান্ত স্থির করেছেন। কিন্তু খানার সময় যখন হলো, নিজে তো পোলাও-জর্দা খেলেন, আরো উন্নত মানের খানা পেটে দাফন করলেন, অথচ চাকর বেচারা! তার ভাগ্যে জুটলো ওইসব উচ্ছিষ্ট ও অবশিষ্ট খাবার,

যেগুলো কোনো রুচিশীল মানুষেষর খাবার হতে পারে না। তাহলে এটাও এক প্রকার 'তাতফীফ' বা অসমতা। কেননা, আপনি যখন তার জন্য দু'বেলা খানার বিষয়টি ধার্য করলেন– এর অর্থ হলো, তাকে এমন খানা দিতে হবে যা হবে, রুচিসম্মত তৃপ্তিদায়ক। সুতরাং তাকে উচ্ছিষ্ট খাবার দেয়ার অর্থ হলো, তার হক নষ্ট করা এবং তার প্রতি এক প্রকার অবিচার করা। আর এটাও উল্লিখিত তাতফীকের অন্তর্ভুক্ত।

চাকুরির সময় মাপে কম দেয়া

কোনো ব্যক্তি যদি তার কোম্পানীর সঙ্গে আট ঘন্টার ডিউটিতে চুক্তিবদ্ধ হয়, আর সেই আট ঘন্টার ভেতর যদি সে কাজে ফাঁকি দেয়, তাহলে এটাও 'তাতফীফ' তথা মাপে কম দেয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, আট ঘন্টার ওপর চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো, এ আটটি ঘন্টা কোম্পানীর কাছে বিক্রি করে দেয়া। এখন আট ঘন্টার পরিবর্তে যদি সে ডিউটি করে সাত ঘন্টা, তবে এর অর্থ হবে, এ ব্যক্তি এ ঘন্টা ফাঁকি দিয়েছে। এটা হারাম ও কবীরা গুনাহ্, যেমনিভাবে মাপে কম দেয়া কবীরা গুনাহ। আট ঘন্টার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ডিউটি করলো, সাত ঘন্টা অথচ বেতন নেয়ার সময় বেতন নিলো সম্পূর্ণটা, তাহলে এটা তো অবশ্যই হারাম হবে।

প্রতিটি মিনিটের হিসাব দিতে হবে

একটা সময় ছিলো যখন অফিস-আদালতে মানুষ ব্যক্তিগত কাজ চুরি করে করতো। কিন্তু বর্তমানে এর উল্টোটা হচ্ছে। এখন আর চুরি-টুরির দরকার নেই। অফিস সময়ে ব্যক্তিগত কাজ করা এখন স্বাভাবিক বিষয়। অথচ নিজের অধিকার আদায়ের বেলায় সম্পূর্ণ সচেতন। বেতন বাড়ানোর দাবি, সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর আন্দোলন, এর জন্য মতবিনিময় সভা ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন চলছে অহরহ। নিজের দায়িত্ববোধ নেই, তবুও যেন দাবি-দাওয়ার শেষ নেই। নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব আদায়ে করে ফাঁকিবাজি, আর সুযোগ-সুবিধা লাভ ও বেতন বৃদ্ধির জন্য একপায়ে খাড়া। মনে রাখবেন, এটাও মাপে কম দেয়ার শামিল। এ জাতীয় লোকের জন্যই কুরআনে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর দরবারে প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। এ ব্যাপারে ছাড় দেয়া হবে না মোটেও।

দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদগণ

দারুল উলূম দেওবন্দের নাম কে না জানে। শেষ যামানায় উম্মতের জন্য এক বিরাট রহমত উক্ত প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে অনেক উজ্জ্বল

ব্যক্তিত্ব, যাদের কথা শুনলে জীবন্ত হয়ে ওঠে সাহাবায়ে কেরামের পরিশীলিত জীবন। আমি আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.)-এর মুখে শুনেছি, যাঁরা দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম দিককার উস্তাদ ছিলেন, তাঁরা ছিলেন নিঃস্বার্থ মানব। দারুল উলূমের ব্যস্ত সময়ে যদি তাঁদের কাছে কোনো মেহমান আসতো, তাঁরা মেহমানের জন্য ব্যয়িত সময়টি নোট করে রাখতেন। গোটা মাস এভাবেই করতেন। মাসের শেষে তাঁরা এ বলে দরখাস্ত দিতেন যে, অমুক দিন অমুক সময় আমি ব্যক্তিগত কাজে দারুল উলূমের সময় নষ্ট করেছি। তাই আমার বেতন থেকে ওই পরিমাণে বেতন কেটে নেয়া হোক।

বেতন হারাম হবে

বেতন বাড়ানোর জন্য আবেদন করা বর্তমানের এক সাধারণ বিষয়। কিন্তু বেতন কাটার জন্য আবেদন করা এ সময়ে কল্পনা করা যায় কি? এটা করতে পারেন তারাই, যাঁদের জীবন তাকওয়ার দীপ্তিতে আলোকজ্জ্বল। বর্তমানে আদর্শের বুলি তো সকলেই কপচায়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কতজন তা বাস্তবায়ন করে? বর্তমানের সমাজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। মানুষ আজ দিশেহারা। শ্রমিক শ্রম দিচ্ছে, ঘাম ঝরাচ্ছে, অথচ খান বাহাদুর (!) ইয়ারকন্ডিশনে বসে আড্ডা দিচ্ছে। একদিকে মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে, অপর দিকে সাহেবের (!) জীবন উদ্দাম খুশি আর অবাধ স্বাধীনতায় থৈ থৈ করছে। বলুন, এই সাহেবের বেতন কতটুকু হালাল হচ্ছে? প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা যেমন মাপে কম দেয়ার গুনাহ হচ্ছে, তেমনিভাবে মানুষকে কষ্ট দেয়ার গুনাহও কামাচ্ছে।

সরকারি অফিসের হালচাল

এক সরকারী অফিসারের মুখে শুনেছি, তিনি বলেন– আমার দায়িত্ব হল, উপস্থিতির স্বাক্ষর ও খাতা দেখা-শোনা করা। এক সপ্তাহের উপস্থিতি-রিপোর্ট পরের সপ্তাহে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে পেশ করি। কিন্তু সমস্যা হল, আমাদের অফিসে তরুণ-যুবকের সংখ্যা বেশ। এদের অধিকাংশই সন্ত্রাসও। অফিসের কোনো নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা এরা করে না। অনেক সময় অফিসে আসেই না। আসলেও দু'-এক ঘন্টার জন্য আসে এবং ক্যান্টিনে বসে আড্ডা মারে। বড় জোর আধ ঘণ্টা অফিসের কাজ করে। তারপর চলে যায়। একবার আমি হাজিরা খাতায় লিখে দিয়েছিলাম যে, অমুক অমুক অনুপস্থিত। এতেই ঘটে গেলো তুলকালাম কাণ্ড। পিস্তল-রিভলবার নিয়ে সরাসরি ছুটে এলো আমার কাছে। পিস্তল হাঁকিয়ে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, হাজিরা দিলেন না কেন? এক্ষুনি হাজিরা লিখে দিন। এই যখন অবস্থা তাহলে বলুন, আমি কী করতে পারি? যদি হাজিরা দিই, তাহলে হবে মিথ্যা। আর যদি না দিই, তাহলে খেতে হবে গুলি। এখন আমি কী করি? এটাই আমাদের অফিসগুলোর হালচাল।

আল্লাহর হকে ত্রুটি করা

সবচেয়ে বড় হক হলো, আল্লাহ তাআলার হক। তার হকের ব্যাপারে ত্রুটি করাও মাপে কম দেয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেমন হযরত উমর (রাযি.) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, নামাযের রুকু-সিজদা ইত্যাদি আদায় করে না এবং নামায দ্রুত শেষ করে দেয়। তিনি তাকে বললেন– لَقَدْ طَفَّفْتَ অর্থাৎ– তুমি আল্লাহর প্রাপ্য আদায়ে কম দিয়েছ।

মনে রাখবেন, যে কোনো প্রাপ্য– চাই আল্লাহর হক হোক কিংবা বান্দার হক– যদি আদায়ে ত্রুটি কর, তাহলে সেটাও 'তাতফীফ' তথা মাপে কম দেয়ার শামিল হবে এবং এ ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত সকল শাস্তি তার ওপরও বর্তাবে।

ভেজাল মেশানোও কবীরা গুনাহ

আসলের সঙ্গে ভেজাল মিশিয়ে দিলে তাও মাপে কম দেয়ার শামিল। যেমন এক ব্যক্তি আটা কিনল এক কেজি। কিন্তু বিক্রেতা তার মধ্যে আধা কেজি অন্য কিছু মিশিয়ে দিল, তাহলে এটা তাতফীফের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, তাতফীফ তথা মাপে কম দেয়ার বিষয়টি শুধু বেচা-কেনা এবং মাপ-পরিমাপের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। এর মর্মার্থ ব্যাপক, ভেজাল মিশ্রিত করে বেচা-কেনাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

পাইকার যদি ভেজাল মেশায়

কেউ কেউ বলে, আমরা হলাম খুচরা বিক্রেতা। আমরা পাইকারীভাবে মাল ক্রয় করে পরে তা খুচরা বিক্রি করি। এখন পাইকার যদি ভেজাল মেশায়, তখন আমাদের কী করার আছে? অনিবার্য কারণে আমরা ভেজাল পণ্য বিক্রি করতেই হয়। এছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।

উক্ত সমস্যার সমাধান হলো, খুচরা বিক্রেতা তার ক্রেতার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে হবে। এটা বলে দিতে হবে যে, ভাই! এ পণ্যে আসল কতটুকু আর ভেজাল কতটুকু– এর গ্যারান্টি আমার কাছে নেই, তবে আমার জানা মতে, এতটুকু আসল এবং এতটুকু ভেজাল।

তবে মার্কেটে যদি এমন কোনো পণ্য থাকে, যার ভেজাল সম্পর্কে মোটামুটি সকলেই জানে। যেমন– বর্তমান সময়ে তো ভেজাল ছাড়া কথাই নেই। এই অবস্থায় বিক্রেতা প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিষয়টি বলে দিতে হবে না। হ্যাঁ, বিক্রেতা যদি মনে করে, এ বেচারা এটা জানে না যে, পণ্যটিতে ভেজাল আছে, তাহলে তখন জানিয়ে দিতে হবে।

ত্রুটি সম্পর্কে গ্রাহককে জানাতে হবে

অনুরূপভাবে ত্রুটিযুক্ত পণ্যের ত্রুটি সম্পর্কে ক্রেতার জানা না থাকলে বিক্রেতা তা জানিয়ে দিতে হবে। তখন ক্রেতার ইচ্ছা হলে কিনবে, অন্যথায় কিনবে না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِيْ مَقْتِ اللّٰهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ

(ابن ماجه، ابواب التجارات، باب من باع عيبا)

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি ত্রুটিযুক্ত পণ্য বিক্রির সময় ওই ত্রুটির কথা গোপন রাখে, সে ব্যক্তির আল্লাহ তাআলার অব্যাহত গযবে এবং ফেরেশতাদের অবিরাম লানতের মধ্যে থাকবে।

ধোঁকাবাজ আমাদের দলভূক্ত নয়

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে গিয়েছিলেন। দেখতে পেলেন, এক লোক গম বিক্রি করছে, তিনি গম বিক্রেতার কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর গমের স্তূপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে নিচের কিছু গম উপরিভাগে নিয়ে এলেন। দেখতে পেলেন, উপরিভাগের গমগুলো ভালো হলেও ভেতরকার গমগুলো ভেজা জ্যাবজ্যাবে ও ভ্যাপসা। ফলে ক্রেতা যখন কিনবে, সে তো উপরিভাগের গমগুলো দেখেই কিনবে। সে মনে করবে, কত সুন্দর সোনালী গম। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এর কারণ কী? ভালোগুলো উপরে রাখলে আর খারাপগুলোকে ভালোগুলো দ্বারা লুকিয়ে রাখলে কেন? খারাপগুলো যদি উপরে রাখতে, তাহলে ক্রেতা দেখতে পেত, তারপর বিবেচনা করে কিনত, অন্যথায় রেখে দিত। ওই ব্যক্তি উত্তর দিলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বৃষ্টির কারণে কিছু গম নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাই সেগুলোকে আমি ভালোগুলো দ্বারা ঢেকে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরূপ করো না। নিচেরগুলো উপরে করে দাও, তারপর তিনি বলেন–

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا (صحيح مسلم، كتاب الايمان)

'যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'

অর্থাৎ– ভেজাল মিশ্রিত করে, ভালো-খারাপ মিলিয়ে যদি বিক্রি করে, তাহলে এটা ভাবা যাবে না যে, আমি ধোঁকা দিইনি। কারণ, আমি তো ভেজাল হলেও মাপে কম দেইনি, বরং এটাও ধোঁকা। আর ধোঁকাবাজ মুসলমানদের দলভুক্ত নয়। বরং এটা মুনাফেকীর নিদর্শন। কোনো মুসলমানের প্রতীক এটা নয়।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ধার্মিকতা

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)। আমাদের ইমাম। আমরা তাঁরই অনুসরণ করি। একজন বড় ব্যবসায়ীও ছিলেন তিনি। কিন্তু চোখধাঁধানো বহু লোভ ও লাভ তিনি বিসর্জন দিয়েছেন উক্ত হাদীসের ওপর আমল করতে গিয়েই। একবারের ঘটনা। কাপড়ের একটা থান তাঁর দোকানে এসেছে। থানটি ছিলো ত্রুটিযুক্ত, তাই তিনি দোকানের কর্মচারীদেরকে বলে দিলেন, এখান থেকে যখন কাপড় বিক্রি করবে, তখন গ্রাহককে তা জানাবে। কিছুদিন পর ওই থানটি বিক্রি হয়ে গেলো। কিন্তু কর্মচারী তা গ্রাহককে বলতে ভুলে গেলো। ইমাম সাহেব একদিন থানটির খোঁজ নিলেন। কর্মচারীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, থানটি গেলো কোথায়? কর্মচারী উত্তর দিলো, হযরত! সেটা তো বেচে দিয়েছি। ইমাম সাহেব বললেন, ত্রুটির কথা জানিয়েছ কি? কর্মচারী উত্তর দিলো, না, তাতো আমি ভুলে গিয়েছিলাম। দেখুন, বর্তমানের কেউ হলে তো কর্মচারীকে 'সাবাশ' দিতো। কিন্তু ইমাম সাহেব তা করলেন না। উপরন্তু ওই গ্রাহকের খোঁজে নেমে পড়লেন। গোটা শহর চষে বেড়ানোর পর অবশেষে তাকে পাওয়া গেলো। তখন ইমাম সাহেব তাকে বললেন, আপনি আমার দোকান থেকে কাপড়ের যে থানটি এনেছিলেন, সেটি ত্রুটিযুক্ত ছিলো। এখন ইচ্ছা করলে সেটা পাল্টিয়ে একটা নতুন থান নিয়ে আসতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে ত্রুটিযুক্তটাই রেখে দিতে পারেন।

আমাদের অবস্থা

অথচ আমাদের অবস্থা আজ স্বার্থমুখর। আমরা যেন ঘোরলাগা প্রাণীতে পরিণত হয়েছি। ত্রুটিযুক্ত পণ্যের ত্রুটি বলে দেয়া তো অনেক দূরের কথা, উপরন্তু আমরা ত্রুটিযুক্তকে ভালো-উত্তম বলে চালানোর জন্য কসমের ওপর কসম খাচ্ছি।

এই যে আমরা আজ যে দুর্দশার শিকার; বিশ্রী, বিরক্তিকর ও হতাশাপূর্ণ জীবন আজ আমাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে এবং আল্লাহর গযব বিরামহীনভাবে আমাদের ওপর আসছে– কেন এমনটি হচ্ছে? কেন আমাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু আজ নিরাপদ নয়? এর কারণ হলো, আমরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত তরীকা ছেড়ে বসেছি। বেচা-কেনা, লেন-দেনসহ সবকিছুতেই আমরা ধোঁকাবাজি করছি। মাপে কম দেয়া, ভেজাল মিশ্রিত করার কারণে আমাদের সমাজটা আজ নিরাপত্তাহীনতা ও অশান্তিতে ভুগছে।

স্ত্রীর হক আদায়ে ত্রুটি করা

অনুরূপভাবে স্বামীর ব্যাপারটাই ধরুন। স্ত্রী থেকে অধিকার আদায়ের বেলায় সে অনেক তৎপর। প্রতিটি কথায় ও কাজে স্ত্রীর আনুগত্য কামনা করে। খানা

পাকানো, ঘরকন্নার কাজ সামাল দেয়া, সন্তানের প্রতিপালন করাসহ সবকিছুই স্ত্রীর কাঁধে সে দিয়ে রেখেছে। এসব কাজ স্বামীর চোখের ইশারাতেই স্ত্রীকে করতে হয়। কিন্তু স্ত্রীর অধিকারের প্রশ্ন এলে স্বামী পিছু হটে যায়। স্ত্রীর অধিকার আদায়ে সে গড়িমসি করে। অথচ কুরআন মাজীদ স্বামীদেরকে নির্দেশ দিয়েছে—

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ কর।' (সূরা নিসা : ১৯)

এবং হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَآئِهِمْ (ترمذى، كتاب الرضاع)

'যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর কাছে উত্তম সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।'

অপর হাদীসে তিনি স্বামীদের প্রতি আদেশ করেছেন—

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَآءِ خَيْرًا (صحيح البخارى، كتاب النكاح)

'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার কর।'

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত জোরালো ভাষায় বলেছেন যে, স্ত্রীদের অধিকার আদায় কর, অথচ আমরা স্বামীরা এ অধিকার আদায়ে ত্রুটি করি। এটাও তাতফীক তথা প্রাপককে প্রাপ্য না দেয়ার অন্তর্ভুক্ত বিধায় শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

মোহর মাফ করিয়ে নেয়াও অধিকার হরণের শামিল

'মোহর' স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর আর্থিক অধিকার। সারা জীবনে এই একটিমাত্র আর্থিক অধিকার স্বামীর পক্ষ থেকে তার পাওনা। অথচ স্বামী এ অধিকারটাও হরণ করে নেয়। জীবনটা স্ত্রীর সঙ্গে কাটিয়ে দেয়, আর মৃত্যুর সময় হলে স্ত্রীর কাছে মোহরের ব্যাপারে মাফ চেয়ে নেয়। এটাই বর্তমানের বিদায়কালীন চিত্র। তখন বেচারী স্ত্রী আর কী-ইবা করতে পারে? বিদায় পথের যাত্রী স্বামী, তাকে তার মুখের ওপর কীভাবে বলে দিবে যে, আমি মাফ করবো না। শেষ অবধি বেচারী স্ত্রী নিরুপায় হয়ে মাফ করে দিতে বাধ্য হয়। মনে রাখবেন, এটা প্রাপককে প্রাপ্য না দেয়ার শামিল। এটা নাজায়েয।

ভরণ-পোষণের অধিকার ক্ষুণ্ন করা

এতো গেলো মোহরের কথা। ভরণ-পোষণের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হলো, স্ত্রীকে এই পরিমাণে ভরণ-পোষণ দিতে হবে, যদ্দারা সে শান্তিতে এবং

স্বাধীনভাবে চলতে পারে। এর মধ্যে কোনো ত্রুটি করা হলে সেটা অধিকার ক্ষুণ্ণ করার শামিল হবে এবং হারাম হবে।

এটা আমাদের গুনাহর শাস্তি

আমাদের অবস্থা হলো, দু'-চারজন একত্র হলে পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মুখে ফেনা তুলি। অশান্তি, অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা অভিযোগের পসরা সাজাই। কিন্তু এসব সমস্যার সমাধান কী হতে পারে, এ ব্যাপারে কোনো ফিকির আমাদের মাঝে নেই। মজলিস শেষে সকলেই কাপড় ঝেড়ে উঠে পড়ি।

অথচ একটু গভীরভাবে ফিকির করলেই বুঝে আসবে যে, এসব কিছু তো ঘটছে না বরং ঘটানো হচ্ছে। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া একটা পাতাও নড়ে না। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাসের তাণ্ডবলীলা– মোটকথা যা কিছু হচ্ছে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। মূলত এসব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব হিসাবে আসছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

'তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।' (সূরা শুরা : ৩০)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ

'যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না।' (সূরা ফাতির : ৪৫)

কিন্তু আল্লাহ বিভিন্ন হেকমতের অনেক গুনাহ মাফ করে দেন। এরপরেও যদি তোমরা বেপরোয়া হয়ে সীমা অতিক্রম করে ফেল, তখন দুনিয়াতেও কিছুটা শাস্তি দেন, যেন নিজেদেরকে শুধরে নিতে পার এবং অবশিষ্ট জীবন যেন সুন্দরভাবে কাটাও। সীমালংঘনের শাস্তি দুনিয়াতেও আছে, আখেরাতে তো আছেই।

হারাম টাকার পরিণাম

পৃথিবীটাতে মানুষ আজ প্রচণ্ড লোভী হয়ে ওঠেছে। টাকার নেশায় মানুষ হারাম পথ-পন্থাও অবলম্বন করতে কুণ্ঠিত হয়। কীভাবে দু'টা টাকা আসবে– শুধু এই একই ধান্ধা, একটাই ফিকির। মনে রাখবে, এ দু'টা টাকা হয়তবা তুমি পাবে;

কিন্তু হারাবে অনেক কিছু। অন্যের পকেট থেকে অসৎ উপায়ে এ দু' টাকা বের করার জের তোমাকে দিতে হবে বিভিন্নভাবে। তোমার শান্তি ও নিরাপত্তা তখন চলে যাবে। কিংবা আরো বড় কোনো দুর্নীতিবাজ বা সন্ত্রাসী তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে। দু' টাকার পরিবর্তে তখন হয়ত হাজার টাকাও খোয়াতে হবে। কারণ, এগুলো হারাম টাকার অনিবার্য ফল, যে ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে। অপরদিকে হালাল উপার্জন দু' টাকা হলেও তোমার জীবনে শান্তি থাকবে, নিরাপত্তা থাকবে।

গুনাহর কারণে আযাব আসে

অনেকে অভিযোগ করে থাকে যে, আমরা তো অত্যন্ত সততা ও ধার্মিকতার সঙ্গে পয়সা উপার্জন করি, এরপরেও আমাদের ওপর এত বিপদ– লুটেরারা দোকান লুট করে নিয়ে গেছে। আসলে এরা যদিও ব্যবসাতে সততা বজায় রেখেছে; কিন্তু অন্য কোনো অঙ্গনে হয়ত গুনাহর রূপ-রস আর গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে যায়। কারণ, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তো এটাই বলেছেন যে, যে কোনো বিপদ-আপদ মূলত মানুষেরই কর্মফল।

পাপের ব্যাপকতায় আযাবও ব্যাপক হয়

দ্বিতীয়ত, গুনাহ যখন সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়, সমাজের প্রায় মানুষই যদি গুনাহটি করে, তখন এর পরিণাম ভোগ করতে হয় পুরো সমাজকেই। তখন আল্লাহর আযাব এলে ব্যক্তি বিশেষের ওপর আসে না, বরং সকলের ওপরই আসে। ইরশাদ হয়েছে–

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً

'আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে, বেঁচে থাক যা বিশেষত শুধু তাদের ওপর পতিত হবে না, যারা তোমাদের মধ্যে অত্যাচারী।' (সূরা আনফাল : ২৫)

এর কারণ হলো, যারা অত্যাচারী নয়, তাদেরও একটা অপরাধ আছে। তাহলো, অত্যাচারীকে বাধা না দেয়ার অপরাধ।

অমুসলিমরা উন্নতি করছে কেন?

এক সময়ে সততা ও বিশ্বস্ততা ছিল মুসলিম ব্যবসায়ীদের মর্যাদা আর গৌরবের প্রতীক। বর্তমানে মুসলমানরা এসব বিষয় যেন ভুলে বসেছে। অপর দিকে, ইংরেজ, আমেরিকান ও ইউরোপিয়ানরা আজ ব্যবসায়ে সততার গুণ রক্ষা করে সফল হচ্ছে। ফলে ব্যবসার উন্নতি করা আজ তাদের জীবনে এক বাস্তব

বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) বলতেন, জেনে রেখো, উন্নতির চাবিকাঠি কাফেরদের হাতে নয়। কেননা, কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে–

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

'নিশ্চয় বাতিল বিতাড়িত।'

এতদসত্ত্বেও যদি দেখ যে, বাতিল উন্নতি করছে, তাহলে বুঝে নিবে, সত্যের রঙে তারা কিছুটা হলেও রঙিন হয়েছে এবং যে কোনো ভালো গুণ তারা অর্জন করে নিয়েছে। আর এ গুণটাই তাদেরকে উন্নতির রাজপথে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যথায় যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানে না, আখেরাত চর্চা করে না, তাদের জীবনে সফলতা আসার তো প্রশ্নই ওঠে না। এরপরেও তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং পার্থিব বিষয়ে সফল হচ্ছে কেন? এর কারণ হলো, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সততার কথা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন, সে সততা আজ আমরা নয় বরং তারা রপ্ত করছে। আমরা তো স্বার্থলিপ্সু হয়ে গিয়েছি। প্রতারণাকে পুঁজি করে ব্যবসা-বাণিজ্য করছি, পরিণামে আমরা হচ্ছি বিফল আর তারা হচ্ছে সফল।

মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য

আমানতদারি, সততা, নিষ্ঠা, ধোঁকা না দেয়া এক সময় এসব ছিলো মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য ও প্রতীক। আমানত-দিয়ানতকে তারা যে কোনো বিনিময়ে বজায় রাখতো। এটাই ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে নির্মিত সমাজের সাধারণ চিত্র। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সেই সোনালী সমাজের যোগ্য সদস্য। তারা প্রয়োজনে ক্ষতির ধাক্কা সামলাতেন, তবুও প্রতারণার আশ্রয় নিতেন না। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অনবদ্য মাধুর্যের প্রতীক হিসাবে গোটা দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করেছেন। এজন্য ব্যবসা, রাজনীতিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা উন্নতির শিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি ও প্রাচুর্য তাদের পদতলে এসে পড়েছিলো। অন্যদিকে আমাদের জীবনাচার চলছে সম্পূর্ণ এর বিপরীত পথে। সাধারণ মুসলমান তো পরের কথা, এমনকি আমাদের মধ্যে যারা নিয়মিত নামায আদায় করেন, তারা পর্যন্ত বাজারে গেলে ভুলে যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও আদর্শের কথা। ফলে দুর্দশা ও হতাশা আজ আমাদের নিত্য সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে।

সারকথা

সারকথা হলো, 'তাতফীফ' তথা মাপে কম দেয়ার অর্থ ব্যাপক। নিজের অধিকার আদায়ে সম্পূর্ণ সচেতন অথচ অপরের অধিকার পূরণে সম্পূর্ণ উদাসীন হলে সে ব্যক্তিই তাতফীফের গণ্ডিতে পড়ে যাবে এবং মাপে কম দেয়ার গুনাহ তার ঘাড়েও এসে পড়বে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبُّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ

(صَحِيْحُ الْبُخَارِيْ، كِتَابُ الْاِيْمَانِ)

'নিজের জন্য যা পসন্দ কর অপর ভাইয়ের জন্য তা পসন্দ করতে না পারলে তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।'

সুতরাং নিজের জন্য এক রকম পাল্লা আর অপরের জন্য ভিন্ন পাল্লা ব্যবহার করো না। একটু ভেবে দেখো, এ কাজটিই যদি তোমার সঙ্গে করা হতো, তাহলে তোমার কাছে কেমন লাগতো? আর তুমি যার সঙ্গে এ আচরণ করছো, সেও তো তোমার মত রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ। মাপে কম দেয়ার কারণে, তার অধিকার আদায় না করার কারণে, তার প্রাপ্য পূরণ না করার কারণে সেও তো দুঃখ পায় এবং এটাকে জুলুম মনে করে। একটু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ, জীবনে কতভাবে, কত জায়গায় এরূপ 'তাতফীফ' করেছো, কতজনকে ধোঁকা দিয়েছ, কতজনের অধিকার নষ্ট করেছ, ব্যবসা-বাণিজ্যে কত প্রতারণা করেছ। এ সবই তো হারাম ছিলো।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। অপরের হক আদায় করার তাওফীক দান করুন। মাপে কম দেয়ার আযাব থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"বর্তমানে আমাদের সমাজ ঝগড়া—বিবাদে ছেয়ে গেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে মানুষ ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ছে। ব্যক্তি ব্যক্তির সঙ্গে, জাতি জাতির সঙ্গে, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে, স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে, বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে রেশারেশিতে অহরহ জড়িয়ে পড়ছে। এমনকি ধর্মীয় পরিবেশেও আজ ঝগড়া—বিবাদের আগুন জ্বলছে। সমাজের সকলেই যেন সম বলিয়ান বিরোধে এ ঝগড়া—বিবাদকে আরো তীব্র করে তুলছে। ফলে বরকতশূন্যতা, অন্ধকার ও দুঃশাসনের অস্বচ্ছ কুয়াশা সমাজকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে এবং ইবাদতের নূর আমাদের মাঝে অনেকটা ফ্যাকাসে রূপ ধারন করেছে।"

ভাই-ভাই হয়ে যাও

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (الحجرات : ١٠)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

হামদ ও সালাতের পর

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

'মুমিনরা পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।' (সূরা হুজুরাত : ১০)

ঝগড়া দ্বীনকে মুণ্ডিয়ে দেয়

কুরআন ও সুন্নাহ মন্থন করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় বিষয়। ঝগড়া ও উত্তেজনামুখর জীবন আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়। পারস্পরিক বিবাদ, জিঘাংসা ও হিংসা মিটানোর বিধানই ইসলাম দিয়ে

থাকে। হাদীসে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'নামায-রোযা ও সদকার চেয়ে উত্তম আমলের কথা কি তোমাদের বলব?' সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছিলেন–

اِصْلَاحُ ذَاتُ الْبَيْنِ فَسَادُ ذَاتُ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ (ابو داؤد، كتاب الأدب، باب فى اصلاح ذات البين)

অর্থাৎ– মানুষের মাঝে বিদ্যমান ঝগড়া মিটমাট করে দিবে। কেননা, দ্বন্দ্ব, কলহ ও ঝগড়া-বিবাদের অপবিত্র প্রতিক্রিয়া খুবই তীব্র। এটা দ্বীনকে শেষ করে দেয়, একেবারে ন্যাড়া করে ছাড়ে।

যে বিষয়টি হৃদয়কে কলুষিত করে তোলে

বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা মানুষের হৃদয়কে বরবাদ করে দেয়। রোযা, নামায, তাসবীহ সবই পড়ে, অন্যের সঙ্গে ঝগড়াও করে, তবে এমন ব্যক্তির হৃদয়প্রাচুর্য থাকে না, বরং তার হৃদয়টা ধীরে ধীরে পাপপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ, ঝগড়ার অনিবার্য ফল হল বিদ্বেষ ও শত্রুতা। আর বিদ্বেষপ্রসূত শত্রুতার কারণে প্রকাশ ঘটে নিত্যনতুন যুলুম-নির্যাতনের। মানুষ তখন দিশেহারা হয়ে শত্রুকে আঘাত করার সব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এমন মানুষের মুখ, হাত সবই তখন শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়।

আল্লাহর দরবারে আমলসমূহ উপস্থাপন

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবারে বান্দার আমলগুলো উপস্থাপন করা হয় আল্লাহর দরবারে। জান্নাতের ফটকগুলো তখন খুলে দেয়া হয়।' প্রশ্ন হয়, আল্লাহ তো বান্দার সমূহ আমল সম্পর্কে জানেন, এমনকি তার অন্তরের খবরও জানেন, তাহলে এ হাদীসে যে বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে আমলগুলো উপস্থাপন করা হয়– এর মর্মার্থ কী? আসলে আল্লাহ তাঁর বান্দার সব বিষয় জানেন এবং পরিপূর্ণভাবেই জানেন– এ কথাটা যথাস্থানে সঠিক। তবে তিনি নিজের বাদশাহী পরিচালনার জন্য হাদীসে উল্লেখিত ব্যবস্থাও রেখেছেন, যেন এর ভিত্তিতে জান্নাতী এবং জাহান্নামী হওয়ার ফায়সালা করা যেতে পারে।

তাকে বাধা দেয়া হবে

আমলগুলো যখন তাঁর সামনে উপস্থাপিত হয়, তখন তিনি দেখেন, কোন বান্দা পুরো সপ্তাহব্যাপী শিরকের গুনাহ করেনি। তারপর যখন তিনি দেখেন যে,

অমুক বান্দা এক সপ্তাহব্যাপী শিরকমুক্ত ছিল, তখন তার ব্যাপারে ঘোষণা দেন, একে মাফ করে দেয়া হলো। অর্থাৎ– জাহান্নাম তার স্থায়ী-নিবাস নয়, বরং একটা সময়ে সে জাহান্নাম থেকে অবশ্যই নিষ্কৃতি পাবে এবং জান্নাতে যাবে। লক্ষ্য করুন, উক্ত ঘোষণার সঙ্গে তখন তিনি এ ঘোষণাও দেন যে,

إِلَّا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا

(ابو داؤد، كتاب الادب، باب فيمن يهجر اخاه المسلم)

'কিন্তু যে দুই ব্যক্তির রয়েছে বিবাদ ও বিদ্বেষ, তাদেরকে বাধা দেয়া হবে। তার ব্যাপারে বলা হবে, 'এ ব্যক্তি জান্নাতী কিনা, এ ফায়সালা আমি এখুনই দিচ্ছি না। আগে তারা পারস্পরিক বিবাদ মিটিয়ে ফেলুক, তারপর তাদের ব্যাপারে ফায়সালা দেয়া হবে।'

বিদ্বেষ থেকে কুফুরী

প্রশ্ন হতে পারে, এ জাতীয় ব্যক্তিকে জান্নাতী ঘোষণা দেয়া হবে না কেন? এর কারণ হলো, আল্লাহর বিধান হলো, মানুষ তার গুনাহ পরিমাণে শাস্তি ভোগ করবে, যার গুনাহ যেমন হবে, তার শাস্তিও তেমন হবে, নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগের পর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। এখানে দেখার বিষয় হলো যে, অন্যান্য গুনাহ কুফর ও শিরকের আশঙ্কা থেকে মুক্ত। কিন্তু ঝগড়া-ফ্যাসাদের গুনাহ কুফর ও শিরকের আশঙ্কাযুক্ত। কুফর ও শিরকের আশঙ্কামুক্ত গুনাহগুলোর ক্ষেত্রে এ ঘোষণা দেয়া যেতে পারে যে, এ ধরনের গুনাহগার জান্নাতী। কারণ, হতে পারে কৃত গুনাহগুলোর জন্য সে অনুতপ্ত হবে, তাওবা করবে, তারপর সম্পূর্ণ মাফ পেয়ে জান্নাতের যোগ্য হয়ে যাবে। কিংবা যদি সে অনুতপ্ত না হয়, তাহলে নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করবে, এরপর জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং তার ব্যাপারে এ ঘোষণা দেয়া অযৌক্তিক নয় যে, সে জান্নাতী। পক্ষান্তরে ঝগড়া-ফাসাদ যেহেতু মানুষকে কুফরীর প্রতিও নিয়ে যেতে পারে, শত্রুতাবশত মানুষ কুফরী আচরণও করে বসতে পারে, তাই তার ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ার ফায়সালা দেয়া যায় না। এটাই তার ব্যাপারে ঘোষণা না দেয়াটাই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত।

শবে বরাতেও মাফ পাবে না

শবে বরাত সম্পর্কে একটি হাদীস আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ রাতে আল্লাহর রহমত তাঁর বান্দার প্রতি বর্ষিত হয়। বনু কালব গোত্রের বকরীগুলোর গায়ে যত পশম আছে, আল্লাহ তাঁর বান্দার সেই পরিমাণ গুনাহ মাফ করে দেন। রহমতের এ রাতে,

মাগফিরাতের এ স্নিগ্ধ সময়ে দুই হতভাগা রহমত-মাগফিরাত থেকে বঞ্চিত থাকে। ১. হিংসুক, বিদ্বেষী ও শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি, ২. ওই ব্যক্তি যে টাখনুর নিচে কাপড় পরে।

বুগ্য কাকে বলে?

অপরের ক্ষতি কামনা তথা অমুকের ক্ষতিসাধন কীভাবে করা যায়, কীভাবে তার কুৎসা রটানো যায়, কীভাবে তাকে তাচ্ছিল্য করা যায়, কীভাবে তার ব্যবসা বন্ধ করা যায়, মোটকথা কীভাবে তার ক্ষতি করা যায়– এ জাতীয় ফিকিরে মত্ত থাকার নাম 'বুগ্য' তথা বিদ্বেষ।

তবে অত্যাচারীর হাতে অত্যাচারিত হলে তাকে দমন করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। অত্যাচারিত ব্যক্তি যেহেতু যুলুমের শিকার, তাই প্রতিশোধের আগুন তার মাঝে জ্বলে ওঠবে– এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও লক্ষ রাখতে হবে যে, মযলুমের এই স্পৃহা যেন 'বুগ্য' পর্যায়ে না যায়। যালিমের অহেতুক ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করলে সেটাও 'বুগ্য' এর শামিল হবে।

হিংসার চমৎকার চিকিৎসা

'বুগ্য' এর উৎপত্তিস্থল হলো হিংসা। প্রথমে হিংসা জাগে, তারপর আরও সামনে এগুতে থাকে এবং 'বুগ্য' তথা বিদ্বেষের রূপ ধারণ করে। তাই 'বুগ্য' থেকে বাঁচতে হলে প্রথমে হিংসা থেকে বাঁচতে হবে। অপরের নেয়ামত কিংবা গুণ বা কল্যাণ ইত্যাদি দেখে অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হওয়ার নামই হলো হিংসা। বুযুর্গানে দ্বীন এর একটা চিকিৎসাপদ্ধতি দিয়েছেন। তাহলো, যার ওপর হিংসা হয়, তার জন্য দু'আ করবে। বলবে, 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে যে নেয়ামতটি দান করেছেন, সেটি আরো বাড়িয়ে দিন, তাকে আরো উন্নতি দান করুন।' এ ধরনের দু'আ করা যদিও নিতান্ত অস্বস্তিকর, তবুও নফসের ওপর রোলার চালাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের জন্যও দু'আ করবে যে, 'হে আল্লাহ! আমার অন্তরে হিংসার আগুন জ্বলছে, দয়া করে আপনি তা নিভিয়ে দিন।' বিশেষ করে নামাযের পর এ দু'আগুলো করবে, তাহলে হিংসা খতম হয়ে যাবে এবং বিদ্বেষও দূর হয়ে যাবে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম চরিত্র

মক্কার কাফিরদের তূনীরে এমন কোনো তীর ছিলো না, যেটি তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ছুঁড়ে মারেনি। এমনকি তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র খুনের পিয়াসীও হয়েছিলো। ঘোষণা করেছিলো, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রেফতার করে তাদের হাতে তুলে দিতে পারবে, তাকে

একশ' উট পুরস্কার দেয়া হবে। উহুদ যুদ্ধের কথা তো আমরা সকলেই জানি। তীরবৃষ্টির মাঝে পড়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তাক্ত হয়েছেন। সে দিন তাঁর পবিত্র চেহারা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলো। পবিত্র দাঁত শহীদ হয়েছিলো, জীবনের এমন কঠিন মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ ছিলো এই–

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

'হে আল্লাহ! আমার জাতি অবুঝ। আমার সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না, তাই তারা যুলুম করছে। আপনি তাদেরকে হেদায়াত দান করুন।'

লক্ষ্য করুন! জাতি বিদ্বেষে ফেটে যাচ্ছে, তারপরেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে কোনো হিংসা নেই, কোনো বিদ্বেষ নেই। কত কোমল ও অনুপম ছিলো তাঁর চরিত্র। শত্রুতার মোকাবেলায় শত্রুতা নয়; বরং দু'আ করাই ছিলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র। হিংসা ও বিদ্বেষের চিকিৎসা এভাবেই হয়। শত্রুর জন্য দু'আ করলে বিদ্বেষ তখন পালিয়ে বেড়ায়।

ঝগড়া ইলমের নূরকে বিলুপ্ত করে দেয়

ইমাম মালিক (রহ.) বলেছেন, ঝগড়ার একটা পদ্ধতি হলো, শরীরের মাধ্যমে ঝগড়া করা। যেমন ঝগড়ার সময় হাত-পা ইত্যাদি ব্যবহার করা। এছাড়াও ঝগড়ার আরেকটি পদ্ধতি রয়েছে, যা পড়ালেখা জানে এমন লোক বিশেষ করে উলামায়ে কেরামের মাঝে হয়ে থাকে। একে বলা হয়– মুনাযারা, মুবাহাছা, মুজাদালা, বহছ ইত্যাদি। যেমন একজন আলেম একটা কথা বললো, অপরজন ওটাকে খণ্ডন করে দিলো। একজন দলীল পেশ করলো, অপরজন তা খণ্ডন করলো। প্রশ্ন-উত্তর, দলীল উপস্থাপন ও খণ্ডন– এভাবে চলতে থাকলো। এ লক্ষ্যে বহছ বিতর্ক সভা, বই-পাল্টা বই রচনা ইত্যাদি অব্যাহতভাবে চলতে থাকলো। ঝগড়ার এ পদ্ধতিও নিন্দনীয়। আমাদের বুযুর্গগণ এটাকেও এড়িয়ে চলেছেন। কারণ, এ জাতীয় ঝগড়াও তাঁরা পসন্দ করতেন না। ঝগড়া ঈমানের নূরকে বিলুপ্ত করে দেয়।' তিনি আরো বলেছেন–

اَلْمِرَاءُ يُذْهِبُ بِنُوْرِ الْعِلْمِ

অর্থাৎ– 'ইলমী ঝগড়া ইলমের নূরকে নিভিয়ে দেয়।'

এখানে আরেকটি বিষয়ও জানা প্রয়োজন। তাহলো, 'মুযাকারা' ও 'মুজাদালা' তথা পারস্পরিক মতবিনিময় ও ঝগড়া-ঝাটি– দুটি ভিন্ন বিষয়। যেমন

কোনো আলেম একটি ফতওয়া পেশ করলো, সেই ফতওয়ার ওপর অন্য এক আলেমের আপত্তি আছে, তাহলে উভয়ে বসতে পারেন, মতবিনিময় করতে পারেন। এটাকে বলা হয় 'মুযাকারা'। এটা প্রশংসনীয়। পক্ষান্তরে এক ফতওয়া ঠেকানোর জন্য আরেক ফতওয়া, এ লক্ষ্যে গ্রন্থ-পাল্টা গ্রন্থ রচনা করা, লিফলেট বিতরণ করে এ ঝগড়াকে আরো তুঙ্গে নিয়ে যাওয়া মোটেও প্রশংসাযোগ্য নয়। বুযুর্গানে দ্বীন এটা থেকেও নিষেধ করেছেন।

হযরত থানবী (রহ.)-এর বাক-বিচক্ষণতা

হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর বাকশক্তি ছিলো চমৎকার। কেউ কোনো মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করলে তাঁর ভাষার সাবলীল ধাক্কায় লোকটি কয়েক মিনিটের মধ্যে একেবারে চুপসে যেতো। এ প্রসঙ্গে ডা. আবদুল হাই (রহ.) একটি ঘটনা বলেছেন। একবার হযরত থানবী অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে গিয়েছিলেন। সে সময়কার কথা। একবার তিনি বলে ওঠলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করে বলছি, পৃথিবীর সকল বুদ্ধিজীবি যদি একজোট হয় এবং ইসলামের সাধারণ ব্যাপারেও আপত্তি বা অভিযোগ প্রকাশ করে, তখনও 'ইনশাআল্লাহ' মাত্র দু' মিনিটের মধ্যে সকলকে নিরুত্তর করে দেয়ার মতো সক্ষমতা এ অধমের আছে।' তারপর তিনি বলেন, 'আমি তো সাধারণ একজন ছাত্র বৈ কিছু নয়। ওলামায়ে কেরামের প্রতিভা তো আরো বহুগুণে বেশি।'

মুনাযারার ফায়দা নেই বললেই চলে

হযরত থানবী (রহ.) নিজেই বলেছেন, 'তখন দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে সদ্য দরসে নেযামী শেষ করেছি, অন্তরে প্রবল বাসনা মুনাযারা করার প্রতি। শিয়া, লা-মাযহাবী, বেরলবী, হিন্দু ও শিখদের সঙ্গে মুনাযারা করার জন্য অতি উৎসাহী ছিলাম। তাই অব্যাহতভাবে একবার এক দলের সঙ্গে মুনাযারা চালিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মুনাযারা থেকে একেবারে তাওবা করে নিয়েছি। কারণ, শেষ পর্যন্ত আমার অভিজ্ঞতা হলো, মুনাযারায় তেমন কোনো ফায়দা নেই। বরং নিজের অন্তপ্রাণে এর প্রভাব পড়ে। এজন্য এখন একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।

জান্নাতে ঘরের জামানত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ (ترمذى، باب ماجاء فى المراء)

'যে ব্যক্তি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকলো, তার জন্য আমি জান্নাতের উৎকৃষ্টা স্থানে ঘর নিয়ে দেয়ার যিম্মাদারী নিচ্ছি।'

উক্ত হাদীস থেকে অনুধাবন করুন, ঝগড়া মেটানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফিকির কত তীব্র ছিলো। তাই যালিমের যুলুম বরদাশত করতে পারলে তখনও ঝগড়া থেকে বেঁচে থাকা ভালো। এক্ষেত্রে যদিও প্রতিশোধের অনুমতি আছে, তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে ঝগড়া এড়িয়ে যাওয়ার।

ঝগড়ার পরিণাম

বর্তমানে আমাদের সমাজ ঝগড়া-বিবাদে ছেয়ে গেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে কেন্দ্র করে মানুষ ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ছে। ব্যক্তি ব্যক্তির সঙ্গে, জাতি জাতির সঙ্গে, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে, স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে, বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে, ভাই ভাইয়ের সঙ্গে অহরহ দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে। এমনকি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও ঝগড়ার আগুন জ্বলছে। সমাজের সকলেই যেন সমবলীয়ান বিরোধে এ ঝগড়া-বিবাদকে আরো তীব্র করে তুলছে। ফলে বরকতশূন্যতা, অন্ধকার ও দুঃশাসনের অস্বচ্ছ কুয়াশা সমাজকে বিমর্ষ করে দিচ্ছে। ইবাদতের নূর আমাদের মাঝে আজ অনেকটা ফ্যাকাসে রূপ ধারণ করেছে।

বিবাদ যেভাবে মিটাবে

প্রশ্ন হলো, এ ঝগড়া-বিবাদের অবসান কীভাবে হবে? এ সুবাদে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর একটি বাণী আপনাদেরকে বলবো। এটি কেবল বাণী নয়, বরং একটি সোনালী নীতিও। বাস্তব জীবনে এটির ওপর আমল করতে পারলে আশা করি, পঁচাত্তর ভাগ বিবাদের অবসান এখানে হয়ে যাবে।

তিনি বলেছেন, 'তোমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে, তাহলো এ পৃথিবীর মানুষের কাছে কোনো আশা করবে না। মানুষের কাছে মানুষের চাওয়া-পাওয়া কমে গেলে 'ইনশাআল্লাহ' অন্তরে ঝগড়া-বিবাদের চিন্তাও আসবে না।'

অপরের প্রতি উত্থাপিত অভিযোগের উৎপত্তি আশা-আশাঙ্ক্ষা থেকে হয়। যেমন এরূপ আশা করা যে, অমুকের এ কাজটি করা উচিত ছিলো, অথচ সে করেনি। আমাকে যেমনটি সম্মান করা উচিত ছিলো, তেমনটি করেনি। আমি তার থেকে যে ধরনের আচরণের আশা করেছিলাম, সে ধরনের আচরণ সে দেখায়নি। অমুককে একটা উপহার দিয়েছিলাম, সে ধন্যবাদ পর্যন্ত বলেনি ইত্যাদি। এ জাতীয় আশা না করাই ভালো। কারণ, আশা পূরণ না হলে তখন মনে ব্যথা পাবে। ব্যথা থেকে সৃষ্টি হবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'কারো প্রতি কোনো অভিযোগ থাকলে সরাসরি গিয়ে তাকে বল, তোমার প্রতি আমার এ অভিযোগ আছে। তোমার অমুক কথাটি আমার কাছে ভালো লাগেনি, এ বলে মনকে সাফ করে নাও।'

অথচ বর্তমানে মন সাফ করে নেয়ার প্রচলন একেবারে নেই বললেই চলে। মনোকষ্ট জিইয়ে রাখাটাই বর্তমান যুগের মানুষের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। এভাবে এক অভিযোগ থেকে তৈরি হয় অন্য অভিযোগ। এক প্যাচ থেকে জন্ম নেয় নতুন আরেকটি প্যাচ। সবশেষে এমনভাবে জট পাকিয়ে যায় যে, মাথা খুঁজে বের করাটাই তখন দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। যার অনিবার্য ফল হিসাবে জ্বলে ওঠবে বিদ্বেষ ও বিবাদের আগুন।

আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্জন কর

এজন্য হযরত থানবী (রহ.) বলেছেন, 'কারো প্রতি কোনো আশা না রাখার মাধ্যমে বিবাদের শিকড় কেটে দাও। আশা সৃষ্টির প্রতি নয়; বরং আশা করবে আল্লাহর কাছে। সৃষ্টির প্রতি আশা রাখতে পার, তবে সুন্দর ব্যবহারের নয়;বরং তিক্ত ব্যবহারের। তিক্ততার আশা রাখার পর মিষ্টি ব্যবহার পেলে অন্তর আনন্দে নেচে ওঠবে। আর তখনি আল্লাহর শোকর আদায় করবে যে, 'হে আল্লাহ! এটা একমাত্র আপনারই কারিশমা, আপনারই দয়া।' তিক্ত ব্যবহারের আশা রাখার পর তিক্ত ব্যবহার পেলে ভাববে যে, আমি তো এটাই আশা করেছিলাম। এর ফলে অভিযোগ কিংবা বিদ্বেষ অন্তরে জায়গা নিতে পারবে না। শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ারও তখন সূত্র থাকবে না। অতএব, কামনা-বাসনা মাখলুকের কাছে নয়, বরং আল্লাহর কাছে রাখতে হবে।

প্রতিদানের নিয়ত রেখো না

হযরত থানবী (রহ.) আরেকটি সোনালী নীতির কথা বলেছেন যে, যখন অপরের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করবে, তখন শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করবে। যেমন কারো জন্য সুপারিশ করলে কিংবা কারো প্রতি সম্মান দেখালে তখন এ কথাই নিয়ত করবে যে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করছি, নিজের আখিরাতকে সমৃদ্ধ করার জন্য করছি। স্নিগ্ধ আচরণ এ জাতীয় নিয়তে কর, তাহলে প্রতিদান পাওয়ার আশা আর থাকবে না।

যেমন এক ব্যক্তির সঙ্গে তুমি খুব ভালো ব্যবহার করেছো। তারপর দেখা গেলো, সে তা স্বীকারই করলো না। তাহলে এতে নিশ্চয় তোমার মন কষ্ট পাবে।

কিন্তু যদি তুমি উক্ত উত্তম আচরণটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতে, তাহলে কোনো কষ্ট হতো না। কারণ, তোমার উদ্দেশ্য তো হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি।'

উল্লিখিত দুটি সোনালী নীতি যদি আমরা মেনে চলতে পারি, তাহলে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ 'ইনশাআল্লাহ' আপনা আপনি মিটে যাবে এবং এ হাদীসটির ওপর আমল হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'যে ব্যক্তি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও বিবাদ বর্জন করবে, আমি নিজে তার জন্য জান্নাতের উৎকৃষ্ট স্থানে ঘর বানিয়ে দেয়ার যিম্মাদারী নিচ্ছি।

কুরবানীর উজ্জ্বল নমুনা

আব্বাজান মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.)কে দেখেছি, আজীবন তিনি হাদীসটির ওপর আমল করেছেন। বিবাদ নিরসনে নিজের বড় বড় হক থেকেও সরে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর এমনি একটি ঘটনা আছে, যা অবিশ্বাস্য। দারুল উলূম করাচীর বর্তমান অবস্থান কাওরাঙ্গিতে। পূর্বে এটি ছিলো নানকওয়াড়ার একটি ছোট ভবনে। দারুল উলূম যখন বড় হয়ে গেলো, তখন স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দিলো। তাই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ালো, প্রশস্ত ও খোলামেলা একটা পরিবেশে দারুল উলূমকে নিয়ে যাওয়ার। এরই মধ্যে আল্লাহর সাহায্য চলে এলো, শহরের মাঝামাঝি অবস্থানে চমৎকার ও খোলামেলা একটি জায়গা সরকারের পক্ষ থেকে মিলে গেলো। বর্তমানের ইসলামিয়া কলেজ সেই জায়গাটিতেই অবস্থিত। হযরত মাওলানা শিব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর কবরও সেখানেই। খোলামেলা পরিবেশের এ জায়গাটা দারুল উলূমের নামে বরাদ্দও হয়ে গিয়েছিলো। জমির কাগজ-পত্রসহ সবকিছু ঠিকঠাকও করা হয়েছিলো। টেলিফোন লাইনও চলে এসেছিল।

তারপর দারুল উলূমের ভিত্তিপ্রস্তর যখন হয়, তখন একটা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিলো। দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামে সেই সম্মেলনে এসেছিলেন। হঠাৎ সেই সম্মেলনেই দেখা দিলো বিপত্তি। কিছু লোক বিবাদ সৃষ্টি করে বসলো যে, জায়গাটা দারুল উলূমকে দেয়া উচিত হয়নি। বরং উচিত ছিলো অমুক জিনিসের জন্য হওয়ার। বিবাদ সৃষ্টিকারীরা এমন কিছু লোককেও তাদের দলে ভিড়াতে সক্ষম হলো। যারা আব্বাজানের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আব্বাজান প্রথমে চেষ্টা করেছেন, কীভাবে বিবাদ শেষ করা যায়? কিন্তু কিছুতেই কাজ হলো না। তাই আব্বাজান ভাবলেন, যে মাদরাসার সূচনা হবে বিবাদের মাধ্যমে, তার মধ্যে কী বরকত থাকতে পারে? এজন্য আব্বাজান নিজের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, জায়গাটা আমি ছেড়ে দিলাম।

এর মধ্যে বরকত দেখছি না

দারুল উলূমের পরিচালনা কমিটি এ ঘোষণা শুনে তো একেবারে হতবাক। তারা আব্বাজানকে বললেন, হযরত! আপনি এটা কী বলছেন? এতো বড় জায়গা, তাও শহরের মাঝখানে, কত চমৎকার পরিবেশে, এমন জায়গা পাওয়া কী চাট্টিখানি কথা! জায়গা তো আপনার দখলেই আছে, কাগজপত্রও ঝামেলামুক্ত। তাহলে আপনি কেন সরে আসবেন?' আব্বাজান তাদেরকে উত্তর দিলেন, 'আপনাদেরকে আমি বাধ্য করছি না। কারণ, পরিচালনা কমিটিই এ জায়গার প্রকৃত হকদার। তাই আপনারা ইচ্ছা করলে মাদরাসা করতে পারেন। তবে আমি আপনাদের সঙ্গে থাকবো না। কারণ, যেই মাদরাসার সূচনাই হবে বিবাদের মাধ্যমে, তার মধ্যে কোনো বরকত আমি দেখছি না।' তারপর তিনি পরিচালনা কমিটির সদস্যদেরকে একটি হাদীস পড়ে শুনালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি হকের ওপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-বিবাদ থেকে সরে আসবে, আমি নিজে তার যিম্মাদারী নিচ্ছি যে, তাকে জান্নাতের মধ্যখানে ঘর বানিয়ে দেয়া হবে।' আপনারা বলতে চাচ্ছেন, এ সুন্দর জায়গা শহরের ভেতরে আর কোথায় পাবো। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আমি জান্নাতের মাঝখানে তাকে ঘর বানিয়ে দিবো। একথা বলে তিনি জায়গাটা ছেড়ে দিলেন। বর্তমানে এত বড় কুরবানীর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে কি!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যার পূর্ণ আস্থা রয়েছে, ভক্তি ও ভালোবাসা রয়েছে, সেই এমন কাজ করতে পারে। তারপর আল্লাহর রহমত দেখুন, আল্লাহ তাআলা আরো কয়েক গুণ বড় জায়গা মিলিয়ে দিলেন, বর্তমানের দারুল উলূম সেই জায়গাতেই অবস্থিত।

আব্বাজানকে সারা জীবন দেখেছি, উক্ত হাদীসের ওপর তিনি আমল করে গেছেন। এতো একটি উদাহরণ পেশ করলাম। অন্যথায় এ ছিলো তাঁর সারা জীবনের আমল। অথচ আমরা তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলি। স্থায়ী বিবাদে আমরা প্রতিনিয়ত জড়িয়ে পড়ি। হিংসা-বিদ্বেষ মনের মাঝে গেঁথে ফেলি। অথচ এ ঝগড়া-বিবাদ মানুষের দ্বীন-ধর্ম ন্যাড়া করে দেয়। তাই আসুন! আল্লাহর ওয়াস্তে বিবাদকে দাফন করে দিন। কারো মাঝে ঝগড়া-বিবাদ দেখতে পেলে মেটানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

বিবাদ মিটিয়ে দেয়া সদকা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامِىْ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ، تَعْدِلُ

بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّتِهٖ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ (مسند احمد ج ٢ ص ٣١٦)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানব শরীরের প্রতিটি জোড়ার মোকাবেলায় একটি করে সদকা দেয়া তার কর্তব্য। যেহেতু প্রতিটি জোড়াই আল্লাহর নেয়ামত। আর আল্লাহর নেয়ামতের শোকর আদায় করা ওয়াজিব। একজন মানুষের শরীরে তিনশ' ষাটটি জোড়া থাকে। সুতরাং প্রতিটি মানুষের ওপর কর্তব্য বর্তায়, প্রতিদিন তিনশ' ষাটটি করে সদকা দেয়ার। আল্লাহ অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। তিনি চান বান্দা এ সদকাগুলো যেন সহজেই দিতে পারে। এ লক্ষ্যে তিনি সদকা দানের পদ্ধতি করেছেন অতি সহজ। তাই তাঁরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু'জনের মাঝে বিরোধ চলছিলো, আর তুমি মধ্যস্থতা করে তা মিটিয়ে দিলে, তাহলে এটাও সদকা। একজন মানুষ ঘোড়ায় চড়তে পারছে না, তুমি সাহায্যের জন্য এগিয়ে গিয়েছিলে, তোমার সহযোগিতায় সে ঘোড়ায় চড়তে পেরেছে, তাহলে তোমার এ সহযোগিতাটাও সদকা। আরেক ব্যক্তি হয়ত বোঝা ওঠাতে পারছিলো না, তুমি একটু সহযোগিতা করে তার বোঝাটি ওঠিয়ে দিলে, তাহলে এটাও সদকা। অনুরূপভাবে ভালো কথা বললে, কল্যাণের কথা শুনালে সেটাও সদকা। যেমন এক ব্যক্তি খুব পেরেশান, তুমি সেটা লক্ষ্য করে তাকে কিছু সান্ত্বনা দিলে সেটাও সদকাভুক্ত হবে। তেমনিভাবে নামাযের উদ্দেশ্যে যখন মসজিদে যাও, তখন তোমার প্রতিটি কদমও সদকা হিসাবে পরিগণিত হয়। অনুরূপভাবে পথ-ঘাট থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়াও এক প্রকার সদকা।

ইসলামের কারিশমা

وَعَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ اَبِيْ مُعِيْطٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِيْ خَيْرًا اَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا (صحيح البخارى، كتاب الصلح، باب ليس الكذاب الذى...)

মহিলা সাহাবী উম্মে কুলসুম (রাযি.) উকবা ইবনে আবি মুঈত-এর মেয়ে। উকবা ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোর শত্রু। একজন

সম্পন্ন মুশরিক। আবু জাহল ও উমাইয়া ইবনে খালফ-এর মতোই ছিলো তার শত্রুতা ও বিদ্বেষ। এই সেই লোক যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বদদোয়া করেছিলেন–

اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبًا مِنْ كِلَابِكَ (فتح البارى ج ٤ ص ٣٩)

'হে আল্লাহ! আপনার কোনো এক হিংস্রপ্রাণী তার ওপর লেলিয়ে দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদোয়া ছিলো অব্যর্থ। পরিশেষে সে বাঘের আক্রমণে মারা যায়। ইসলামের এত বড় দুশমনের ঘরে সাহাবী উম্মে কুলসুম (রাযি.)-এর জন্ম। পিতা কুফরের অন্ধকারে নিমজ্জিত আর মেয়ে ঈমানের দীপ্তিতে আলোকিত।

এমন ব্যক্তি মিথ্যুক নয়

উম্মে কুলসুম (রাযি.) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি লোকদের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে উত্তম কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলে অথবা একে অপরের প্রতি সুধারণা সৃষ্টি করার জন্য এবং রেশারেশি ও শত্রুতা নির্বাপিত করার জন্য একজনের কথা অপর জনের কাছে পৌছিয়ে দেয়, সে মিথ্যাবাদী নয়।' অর্থাৎ সে ব্যক্তি যদি এমন কথা বলে যে, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে সত্য নয়, তবুও সে রেশারেশি ও ঘৃণা দূর করার উদ্দেশ্যে বলছে, তাহলে এ ধরনের কথা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

সরাসরি মিথ্যা হারাম

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, স্পষ্ট মিথ্যা নাজায়েয। তবে এমনভাবে ইঙ্গিতমূলক কথা বলা যে, যার বাহ্যিক দিকটা মিথ্যা হলেও বাস্তবে মিথ্যা নয়, তাহলে সেটা জায়েয। যেমন দু'জনের মাঝে জঘন্য বিদ্বেষ বিরাজ করছে, একে অপরের নাম শুনলেও গায়ে জ্বর ওঠে। একজন অপরজনের ঘোরতর শত্রু, তাহলে এ শত্রুতা মেটানোর জন্য এভাবে বলা যাবে যে, দেখ ভাই! তুমি তাকে শত্রু ভাবছো, অথচ সে তোমার জন্য দু'আ করতে আমি দেখেছি।

লক্ষ্য করুন, প্রকৃতপক্ষে এ ব্যক্তি তার জন্য দু'আ করতে শুনেনি, বরং এর উদ্দেশ্য হলো, সে একদিন اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ হে আল্লাহ! আপনি মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিন– এ দু'আ করতে শুনেছিলো। একেই বলে দিলো, তুমি যাকে শত্রু ভাবছো, সে তো তোমার জন্য দু'আ করে। আর মনে মনে বললো, আসলে সে তো সকল মুমিনের জন্য দু'আ করে এবং তুমি তো মুমিনদেরই একজন। তখন এ জাতীয় মিথ্যা কপচানো গুনাহ নয়। বরং

সাওয়াবের কাজ। কারণ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা মিথ্যাভুক্ত হলেও, প্রকৃতপক্ষে এটা তো মিথ্যার ভেতরে লুকায়িত সত্য।

ভালো কথা বলো

আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এ জাতীয় মিথ্যার অনুমতি আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এটি করবে, তখন সে এমন কথাই বলবে, যার দ্বারা পারস্পরিক বিদ্বেষ তুঙ্গে ওঠার পরিবর্তে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তোমার কথা দ্বারা বিবাদমান কলহ বিলুপ্ত হওয়ার পরিবর্তে আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাহলে এটা তো আগুনের মাঝে ঘি ঢেলে দেয়া হবে। এর জন্য তোমাকে অবশ্যই ফল ভোগ করতে হবে।

মীমাংসা করানোর গুরুত্ব

হযরত শেখ সাদী (রহ.)-এর একটি প্রসিদ্ধ বাণী হয়ত আপনারা জানেন যে, তিনি বলেছিলেন–

دروغ مصلحت امیز بهه از راستی فتنه انگیز

'বিবাদ মেটানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা সেই সত্যের চেয়ে উত্তম যা বিবাদ লাগানোর উদ্দেশ্যে বলা হয়।' অবশ্য মিথ্যা দ্বারা স্পষ্ট ও নির্লজ্জ মিথ্যা উদ্দেশ্য নয়। বরং একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ আছে– এমন কথা বলবে। দেখুন, পারস্পরিক বিবাদ-ঝগড়া, ফিতনা-ফাসাদ ও রেশারেশি মেটানোর তাগিদ ইসলামে কী পরিমাণে রয়েছে।

এক সাহাবীর ঘটনা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٌ أَصْوَاتُهَا، وَاِذَا اَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْاٰخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِىْ شَيْءٍ وَهُوَ يَقُوْلُ : وَاللّٰهِ لَا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اَيْنَ الْمُتَالِىْ عَلَى اللّٰهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوْفَ؟ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَلَهُ اِىْ ذَالِكَ اُحِبُّ (صحيح البخارى، كتاب الصلح، باب هل يشير الإمام بالصلح)

'হযরত আয়েশা (রাযি.) বলেছেন, এক দিনের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসেছেন। ইতোমধ্যে দু'জনের কথা কাটাকাটি তাঁর কানে এলো। ঝগড়ার বিষয় ছিলো, একজন অপরজন থেকে ঋণ নিয়েছিলো। ঋণদাতা এখন তার ঋণ চাচ্ছে। কিন্তু ধনী ব্যক্তি তার অপারগতা করে বলছে, এ মুহূর্তে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করার মত অবস্থা আমার নেই। এক কাজ কর, কিছু নাও আর কিছু ছেড়ে দাও। দ্বিতীয়জন তা মানছিলো না বরং সে বলছে, না, তা হবে না। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে একটুও ছাড় দিবো না। এ কথাগুলো বলার সময় ঋণী ব্যক্তি ছিলো অস্থির, আর ঋণদাতা ছিলো উত্তেজিত। তাই তাদের উভয়ের চওড়া আওয়াজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনছিলেন এবং এ অবস্থা দেখে তিনি বের হয়ে বললেন, 'ওই ব্যক্তি কোথায়, যে আল্লাহর কসম করে বলেছে যে, সে নেক কাজ করবে না।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান শুনে ঋণদাতা এগিয়ে গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমিই সেই লোক। আর আমি অবশিষ্ট ঋণ এক্ষুনি মাফ করে দিলাম। আমার ভাই যত কম দিতে চায়, আমাকে দিতে পারবে। অবশিষ্ট ঋণ না নেয়ার জন্য আমি প্রস্তুত।

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা

উত্তেজনায় গমগম করা পরিবেশকে নিমিষেই শান্ত করে দেয়ার মতো গুণ যাদের আছে তারাই তো হলেন এরা- সাহাবায়ে কেরাম। এরপর কী হলো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের প্রয়োজন আর হয়নি। বরং আপনা আপনি ঝগড়া মিটে গেছে। এর কারণ ছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ছিলো অগাধ ও অকৃত্রিম। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে মাত্র একথাটুকু শোনার পর সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস তাঁরা করেননি। আল্লাহ তাআলা আপন মহিমায় সাহাবায়ে কেরামের কিছু আবেগ-দরদ ও গুণ আমাদেরকেও দান করুন। সকল মুসলমানের মধ্য থেকে পারস্পরিক হিংসা, বিদ্বেষ ও বিবাদ বিলুপ্ত করে দিন। সকলকে অপরের হক আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"যদি ক্ষোভ থাকে, তবে কার ওপর ক্ষোভ? রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ওপর? তবুও যান। সাওয়াবের নিয়তে তাকে দেখতে যান। সত্তর হাজার ফেরেশতার দু'আ লাভের আশায় যান। জান্নাতে বাগান লাভের টানে যান। 'ইনশাআল্লাহ' এর কারণে অনেক সাওয়াবের অধিকারী হবেন। আপনার অন্তরে অসুস্থ ভাইয়ের ব্যাপারে যে ব্যক্তিগত ক্ষোভ আছে, তা দরদের জোয়ারে ভেসে যাবে। আল্লাহর ওয়াস্তে এটাকে রুসম মনে করে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিলীন করে দিবেন না। কারণ, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া কোনো রুসম নয়; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। এর জন্য আল্লাহ অনেক সাওয়াব রেখেছেন।"

রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার আদব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَصْرِ الضَّعِيْفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُوْمِ، وَاِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

(صَحِيْح بُخَارِيْ - كِتَابُ الاستيذان باب افشاء السلام)

হামদ ও সালাতের পর।

সাতটি উপদেশ

হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন।

এক. অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া।

দুই. জানাযার পেছনে পেছনে যাওয়া।

তিন. হাঁচি দিয়ে কেউ 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে তার জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলা।

চার. দুর্বলকে সাহায্য-সহযোগিতা করা।

পাঁচ. মযলূমের সহযোগিতা করা।

ছয়. সালামের প্রসার ঘটানো।

সাত. কসমকারীর কসম পূর্ণ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে উল্লেখিত সাতটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এগুলো পালন করা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো মুসলমানের জীবনের জন্য মর্যাদা, গৌরব ও সভ্যতার প্রতীক। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এসব বিষয়ের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

রোগীকে দেখতে যাওয়া একটি ইবাদত

উল্লিখিত সাতটি বিষয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম বিষয়টি হলো, রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া। অসুস্থ ব্যক্তির প্রতি যত্ন নেয়া একজন মুসলমানের হকও। এ আমল আমরা সকলেই করি। দুনিয়াতে এমন লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে, যে কোনো রোগীকে অন্তত দেখতে যাইনি।

তবে এক হলো রুসম পালন। অমুক ব্যক্তি অসুস্থ, তাই দেখতে না গেলে মানুষ কী বলবে– এ জাতীয় চিন্তায় তাড়িত হয়ে আমরা অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর রাখি। তখন এটা হয় ইখলাসশূন্য আমল, যার মধ্যে আন্তরিক প্রশান্তি লাভ হয় না।

অপরটি হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। ইখলাসের নিয়তে, সাওয়াবের আশায় রোগীর সেবা করলে আল্লাহ খুশি হন। বিভিন্ন হাদীসে রোগী দেখার সাওয়াব হিসাবে যেসব ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো তখনই পাওয়া যাবে, যখন ইখলাসপূর্ণ থাকবে।

সুন্নাতের নিয়ত করবে

যেমন এক ব্যক্তি কোনো রোগীকে এ আশায় দেখতে যাচ্ছে যে, আমি অসুস্থ হলে সেও আমাকে দেখতে আসবে। যদি আমার অসুস্থতার সময় সে যদি আমাকে দেখতে না আসে, তাহলে ভবিষ্যতে আমিও তাকে দেখতে যাবো না। তাহলে এটা তো 'বিনিময়' এবং 'রুসম' হয়ে গেলো। এর জন্য সাওয়াব থেকেও বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে এর মধ্যে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত থাকে, 'বিনিময়' কিংবা 'রুসম'-এর গন্ধ না থাকে, তখন সাওয়াব পাওয়া যাবে। আর তখনই বুঝা যাবে যে, এটি ইখলাসপূর্ণ হয়েছে এবং সুন্নাতের ওপর আমল করার লক্ষ্যে হয়েছে।

শয়তানী কৌশল

শয়তান আমাদের ঘোরতর শত্রু। আমাদের ইবাদতগুলোর মাঝে সে তালগোল পাকানোর বেলায় খুবই পটু। যেসব ইবাদত সহীহ নিয়তে করতে পারলে আল্লাহ অনেক সাওয়াব দান করেন এবং আখেরাতে খুবই কাজে আসবে, শয়তান সেগুলোতে বিঘ্ন ঘটায়। শয়তান চায় না, আমাদের আখেরাতের

জগত সুখময় হোক। ইবাদতগুলোতে আমাদের নিয়ত খালেস হোক– এটাও তার কাছে অসহনীয়। যেমন বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করা, তাদের সঙ্গে সদাচরণ করা, তাদেরকে হাদিয়া-তোহফা দেয়া– এগুলো সবই অনেক সাওয়াবের কাজ এবং দ্বীনের অংশও। এসবের মাধ্যমে আল্লাহ খুশি হন এবং প্রতিদানও দেন। কিন্তু যে প্যাঁচ লাগায় তারই নাম শয়তান। সে নিয়তের মধ্যে ভেজাল প্রবেশ করিয়ে দেয়। যার ফলে মানুষ কুচিন্তায় মরে। মানুষ চিন্তা করে, 'আমি শুধু ওই লোকের সঙ্গে সদাচরণ করবো, যে আমার সঙ্গে সদাচরণ করে। কেবল ওই লোককে হাদিয়া দিবো, যে আমাকে হাদিয়া দেয়। বিনিময় যেখানে নেই, সেখানে আমিও নেই। তার বিয়েতে আমি উপহার দিতে যাবো কেন, সে কি আমাকে উপহার দিয়েছে?' এ জাতীয় চিন্তার অনুপ্রবেশ শয়তান ঘটায়। এর কারণেই আজ সমাজে হাদিয়ার প্রচলন কমে গেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মহামূল্যবান সুন্নাত হলো এক মুসলমান অপর মুসলমানকে হাদিয়া দিবে। শয়তানের এসব চাতুরি আমাদেরকে বুঝতে হবে। জওহরকে মাটি করে দেয়ার কুমন্ত্র সে জানে, তাই তার ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে দিতে হবে। হাদিয়া যেন নিছক রুসমে পরিণত না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আত্মীয়তার বন্ধন এবং তার তাৎপর্য

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে, সে এটা দেখে না যে, ওই আত্মীয় আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করলো। এটাই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুপম শিক্ষা। তিনি বলেছেন–

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئْ لٰكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهٗ وَصَلَهَا

(صَحِيْحُ الْبُخَارِىْ، كِتَابُ الأدبِ، بَابُ ليس الوَاصِل بِالْمكافى)

অর্থাৎ– যে বিনিময় প্রত্যাশী, সে প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী নয়। যে সবকিছুতে বিনিময় চায় সে স্বজনপ্রিয় নয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী তাকে বলা হয়, যে তার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বেও সে বন্ধন রক্ষা করে চলে। যেমন আত্মীয় তার জন্য হাদিয়া আনেনি, কিন্তু সে আত্মীয়ের জন্য হাদিয়া নিয়ে গেলো এটাকেই বলে আসল আত্মীয়তা। তবে এক্ষেত্রে নিয়ত থাকতে হবে বিশুদ্ধ। অর্থাৎ হাদিয়াটি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই নিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত পালনে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন, তাই আমি এর মাধ্যমে তাঁর সুন্নাত পালন করছি।

সুতরাং আত্মীয়তার সম্পর্ককে ইবাদত মনে করে তা রক্ষা করে চলবে। নামায পড়ার সময় কেউ কি একথা ভাবে যে, আমার দোস্ত নামায পড়েনি বিধায়

আমিও পড়বো না? এমনটি কেউ ভাবে না। বরং ভাবে যে, আমার ইবাদত আমার জন্য, তার ইবাদত তার জন্য, আমার আমল আমার সঙ্গে যাবে এবং তার আমল তার সঙ্গে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখাও নামাযের মতো একটি ইবাদত। তোমার আত্মীয় এ ইবাদত না করলেও তুমি কর। তুমি তাকে দেখতে যাও, সে অসুস্থ হলে তার সেবা কর।

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার ফযীলত

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اِنَّ الْمُسْلِمَ اِذَا عَادَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَ

(صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل عيادة المريض)

অর্থাৎ 'এক মুসলমান অসুস্থ হলে অপর মুসলমান যখন তাকে দেখতে যায়, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেখানে অবস্থান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন সে জান্নাতের বাগানেই অবস্থান করে।'

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً اِلاَّ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُمْسِىَ وَاِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً اِلاَّ صَلّٰى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ (ترمذى، كتاب الجنائز، باب عيادة المريض)

অর্থাৎ 'কোনো মুসলমান অপর অসুস্থ মুসলমানকে সকালবেলা দেখতে গেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে। সন্ধ্যায় দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে। আর আল্লাহ তাআলা তার জন্য বেহেশতের একটি বাগান বরাদ্দ করে দেন।'

সত্তর হাজার ফেরেশতার দু'আ লাভ

চাট্টিখানি কথা নয়। সত্তর হাজার ফেরেশতার দু'আ লাভ নিশ্চয় অনেক বড় বিষয়। পাশের বাসার অসুস্থ লোকটিকে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য দেখতে গেলে এত বিশাল সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। এরপরেও কি 'বিনিময়ের' প্রতি তাকিয়ে থাকবেন? সে আমাকে দেখে কিনা, আমার অসুস্থতায় তার কোনো দরদ তো আমি দেখি না– এ জাতীয় অভিযোগ-অনুযোগ উত্থাপন করার অর্থ হলো– সত্তর হাজার ফেরেশতার দু'আ থেকে, বেহেশতের বাগান থেকে সর্বোপরি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মহান সুন্নাত থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

অসুস্থ ব্যক্তি যদি ক্ষোভের পাত্র হয়

যদি ক্ষোভ থাকে, তবে কার ওপর ক্ষোভ? অসুস্থ ব্যক্তির ওপর? তবুও যান। সাওয়াবের নিয়তে তাকে দেখতে যান। সত্তর হাজার ফেরেশতার দু'আ লাভের আশায় যান। জান্নাতে বাগান লাভের টানে যান। 'ইনশাআল্লাহ' এর কারণে অনেক সাওয়াবের অধিকারী হবেন। আপনার অন্তরে অসুস্থ ভাইয়ের ব্যাপারে যে ক্ষোভ আছে, তা দরদের জোয়ারে যাবে। আল্লাহর ওয়াস্তে এটাকে রুসম মনে করে এর তাৎপর্য বিলুপ্ত করে দিবেন না। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখা রুসম নয়, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। এর জন্য আল্লাহ অনেক সাওয়াব রেখেছেন।

সময় যেন বেশি না গড়ায়

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার বিষয়ে কিছু আদব আছে। যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন। আসলে জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিক-নির্দেশনা আছে। অথচ আমরা তা আজ ভুলে বসেছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত শিষ্টাচার নিজের জীবন থেকে আমরা বের করে দিয়েছি। যার ফলে জীবন আজ পরিণত হয়েছে আযাবে। তাঁর নির্দেশিত পথ আঁকড়ে ধরলে এখনও সম্ভব যে, জীবনটাকে জান্নাতে পরিণত করা যাবে। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া আদব কী, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ عَادَ مِنْكُمْ فَلْيُخَفِّفْ

অর্থাৎ– অসুস্থ ব্যক্তিকে যখন দেখতে যাবে, তখন অল্প সময়ের মধ্যে কাজ সেরে নিবে। এমন যেন না হয় যে, তুমি তাকে দেখতে গেলে অথচ মুহূর্তটি তার উপযোগী নয়। দরদের কারণে তার কাছে গেলে অথচ পরিবেশটা দেখার উপযুক্ত নয়। তোমার দরদ যেন রোগীর অশান্তির কারণ না হয়। তোমার মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ যেন তার জন্য কষ্টের উপকরণ না হয়। বরং দেখবে, এখন তার সঙ্গে সাক্ষাত করা যাবে কিনা, তার পরিবার-পরিজন তার সঙ্গে এ মুহূর্তে আছে কিনা, তোমার যাওয়ার কারণে পর্দার ব্যবস্থা করা লাগবে, এটা তার জন্য এ মুহূর্তে সম্ভব কিনা, এখন তার আরামের সময় কিনা– এসব বিষয় বিবেচনা করে তারপর সবকিছু অনুকূলে হলে তাকে দেখতে যাবে। এটা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব। এ আদবের প্রতি যত্নশীল হবে।

এটা সুন্নাত পরিপন্থী

রোগীকে দেখতে গেলে সেখানে আঁঠার মতো বসে থাকবে না। এতে রোগী বিরক্ত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে ছিলেন অভিজ্ঞ। এ ব্যাপারে তাঁর চেয়ে প্রাজ্ঞ আর কে হতে পারে? দেখুন! সাধারণত যে কোনো অসুস্থ লোক নিজস্বতা বজায় রেখে একটু অকৃত্রিমভাবে থাকতে চায়। প্রতিটি কাজ সে নিজের মতো করে করতে চায়। কিন্তু মেহমানের সামনে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন অসুস্থ ব্যক্তি চাচ্ছে একটু পা ছড়িয়ে বসতে। সে সময়ে যদি এমন কোনো মেহমান যে তার কাছে সম্মানের পাত্র, তাহলে পা ছড়িয়ে বসাটা তার কাছে ভালো লাগবে না। অথবা সে চাচ্ছে, নিজ ঘরের লোককে কিছু বলবে, কিন্তু মেহমানের সামনে হয়ত তা বলা যাচ্ছে না। এই যে বাধা, প্রতিবন্ধকতা এবং বিরক্তি– এটা তো মেহমানের কারণেই হচ্ছে। মেহমান গিয়েছে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার উদ্দেশ্যে, অথচ এর মাধ্যমে নিজের অজান্তেই তাকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি মেহমান। রোগী দেখার উদ্দেশ্যে গিয়েছো। সাওয়াব কামানোর উদ্দেশ্যে গিয়েছো। লক্ষ্য রাখবে, এটা যেন রোগীর কাছে বিরক্তিকর না হয়। অন্যথায় সুন্নাত পালনের পরিবর্তে আযাবের লালন হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর ঘটনা

মহান সাধক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)। অনেক বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন তিনি। অনেক গুণের সমাহার আল্লাহ তাঁর মাঝে ঘটিয়েছিলেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ মহান ব্যক্তির ভক্ত- অনুরক্তের সংখ্যাও তো আর কম নয়! তাই তাকে দেখার জন্য মানুষ তার বাড়িতে ভিড় জমালো। একের পর এক আসছিলো আর তাঁর খোজ-খবর নিচ্ছিলো। ইত্যবসরে এক লোক এলো, খোঁজ-খবর জিজ্ঞেস করলো, তারপর সেখানে বসে গেলো। বসলো তো বসলোই আর যেন ওঠার নাম নেই। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) চাচ্ছিলেন, এ ব্যক্তি যেন বিদায় হয়। কিন্তু লোকটি যেন এটা বুঝতেই রাজি নয়। সে এদিক-সেদিক কথা বলেই যাচ্ছিলো। এ অবস্থা দেখে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) অভিযোগের সুরে বললেন, ভাই! এমনিতে অসুস্থতার কারণে কষ্ট পাচ্ছি। তার চেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছি যারা দেখতে আসে তাদের পক্ষ থেকে। সময় বোঝে না, পরিবেশ বোঝে না। আসে তো আসেই আর যাওয়ার নাম নেয় না।' লোকটি উত্তর দিলো, 'হযরত! এসব লোকের কারণে নিশ্চয় আপনি কষ্ট পাচ্ছেন, তাই আপনার অনুমতি হলে দরজাটা বন্ধ করে আসতে পারি। তখন আর কেউ আসার সুযোগ পাবে না। আপনি আরাম করতে পারবেন।' আল্লাহর এ বান্দা এতই বেওকুফ যে, এরপরেও তার বোধোদয় হয়

না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) বললেন, 'হ্যাঁ, তাহলে দরজাটা বন্ধ করে দাও। তবে বাইরে গিয়ে বন্ধ করে দাও।'

কিছু মানুষের অনুভূতিশক্তি একটু কম। তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে এভাবেই তাড়াতে হয়।

সময় বুঝে যাবে

মন চাইলো তো রোগীকে দেখতে গেলাম, সেখানে বসে থাকলাম, এটার নাম রোগীর শুশ্রূষা নয়। রোগী দেখার মাকসাদও এটা নয়। ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে শায়খকে কষ্ট দেয়ার নাম 'সেবা' নয়। ভালোবাসার জন্যও বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকতে হয়। বুদ্ধি-বিবেক খরচ না করতে পারলে সে মহব্বত প্রকৃত মহব্বত নয়, বরং এটা নির্বুদ্ধিতা ও শত্রুতা। যেমন ঘুমানোর সময় কিংবা আরামের সময় গিয়ে আপনি উপস্থিত হলেন, বলুন– এটা কী বোকামী নয়?

অকৃত্রিম বন্ধু বিলম্ব করতে পারে

এক অকৃত্রিম বন্ধু অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে গেলো, বন্ধু বন্ধুকে পেয়ে খুশি হলো। বন্ধু এত বেশি সময় কাছে থাক– এটাই বন্ধুর কামনা, ব্যাপারটা যদি এমন হয়, তখন অবশ্য বিলম্ব করার অনুমতি আছে। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো। আমার আব্বাজানের এক প্রিয় উস্তাদ ছিলেন, যাকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। মিয়া আসগর হোসাইন (রহ.)। আব্বাজানের এ উস্তাদ আব্বাজানকেও গভীর স্নেহ করতেন। একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আব্বাজান খবর শুনে তাঁকে দেখতে গেলেন। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে আব্বাজান প্রথমে তাঁকে সালাম দিলেন, ভালো-মন্দ খোঁজ-খবর নিলেন, নির্দিষ্ট দু'আ পড়লেন, তারপর চলে আসার অনুমতি চাইলেন। তখনি মিয়াঁ আসগর হোসাইন (রহ.) একটু অস্থিরচিত্তে বলে উঠলেন, তোমরা হাদীস শরীফে পড়েছো مَنْ عَادَ مِنْكُمْ فَلْيُخَفِّفْ (রোগীকে সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতরে দেখে আসবে) এটা একটা মূলনীতি, রোগী দেখার একটা আদব। কিন্তু এটা কী কেবল আমার জন্য পড়েছো? এ আদবটি কি আমার বেলায়ও প্রয়োগ করতে চাচ্ছো? শোনো, এ মূলনীতি তখন প্রযোজ্য; যখন রোগী কষ্ট পাবে। কিন্তু রোগী যদি সাক্ষাতকারীর বিলম্বের মাঝেই আরাম পায়, তখন এ আদবটি প্রযোজ্য নয়। সুতরাং তুমি? বসে পড়ো। আরেকটু দেরী কর।'

অতএব, বুঝা গেলো, সবখানে, সব পরিবেশে এক ধরনের হুকুম প্রযোজ্য নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষ রোগীর কাছে বিলম্ব করাটাই হলো সুন্নাত। কারণ, উদ্দেশ্য হলো রোগী একটু সান্ত্বনা লাভ করা। সান্ত্বনা সে যেভাবে পাবে, সেভাবেই করতে হবে। তখনই রোগী দেখার সাওয়াব অর্জিত হবে।

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দু'আ করা

রোগী দেখার দ্বিতীয় আদব হলো, তার জন্য দু'আ করা। অর্থাৎ প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে তার খোজ-খবর নিবে, কেমন আছে জিজ্ঞেস করবে। তারপর রোগী যখন তার অবস্থার কথা বলবে, তখন তার জন্য দু'আ করবে। কী দু'আ করবে, সেটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলে দিয়েছেন। তিনি রোগীর জন্য নিম্নোক্ত দু'আটি করতেন–

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَ اللّٰهُ (صحيح البخارى، كتاب المرض، باب ما يقال للمريض)

অর্থাৎ রোগের কারণে যে কষ্ট তুমি পাচ্ছ, এটা আপনার জন্য অনিষ্টকর নয়। তোমার 'কষ্ট' 'ইনশাআল্লাহ' মিষ্টিতে পরিণত হবে। এটা তোমার জন্য গুনাহ মাফের 'কারণ' হবে।

এ দু'আটির দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত. এর মাধ্যমে রোগী এক প্রকার সান্ত্বনা পায়। দ্বিতীয়ত. এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে রোগীর গুনাহ মাফ এবং সাওয়াব লাভের কামনা করা হয়।

অসুস্থতার কারণে গুনাহ মাফ হয়

হাদীসটি নিশ্চয় আপনারা শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একজন মুসলমানের প্রতিটি কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে একেকটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এমনকি কোনো মুসলমানের পায়ে কাঁটা বিধলেও এর বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। এছাড়াও আরেকটি হাদীস রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (صحيح البخارى، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار)

অর্থাৎ 'জ্বর জাহান্নামের উত্তাপের একটি অংশ।'

এ হাদীসের একাধিক ব্যাখ্যা উলামায়ে কেরাম করেছেন। তন্মধ্যে এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, জ্বরের উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপের বিনিময়ে হয়ে থাকে। তথা গুনাহসমূহের কারণে জাহান্নামের যে আগুন ভোগ করতে হতো, এ দুনিয়াতে জ্বরের মাধ্যমে তার বিনিময় দিয়ে দেয়া হয়, যেন জাহান্নামের উত্তাপ তাকে পোহাতে না হয় এবং জ্বরের কারণে যেন সে গুনাহগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ব্যাখ্যার সমর্থনে পূর্বোক্ত হাদীসটিকেও পেশ করা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীর জন্য এ দু'আ করতেন–

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَ اللّٰهُ

অর্থাৎ চিন্তা করো না, এ জ্বরের কারণে তোমার গুনাহ 'ইনশাআল্লাহ' আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন।

সুস্থতার জন্য একটি আমল

অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করার তৃতীয় আদব হলো, যদি পরিবেশবান্ধব হয় এবং আমলটি করলে যদি অসুস্থ ব্যক্তি কষ্ট না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তার কপালের ওপরে হাত রাখবে এবং এই দু'আটি পড়বে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَأْسِ اشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شَافِىَ اِلَّا اَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا (ترمذى، كتاب الجنائز، باب ما ء فى التعوذ للمريض)

'হে আল্লাহ! যিনি সকল মানুষের প্রভু। যিনি কষ্ট দূরকারী, এ রোগকে ভালো করে দিন। আপনি সুস্থতা দানকারী। আপনি ছাড়া কোনো আরোগ্যকারী নেই এবং সকল অসুস্থতার সুস্থতা আপনি দান করুন।'

দু'আটি প্রত্যেকের মুখস্থ রাখা উচিত এবং দু'আটি পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত, যেন সুযোগ হলেই দু'আটি পড়া যায়।

সকল রোগের চিকিৎসা

আরেকটি দু'আ আছে। সেটিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই বর্ণিত। সহজ ও সংক্ষিপ্ত দু'আ। মুখস্থ রাখা তেমন কঠিন নয়। অথচ ফায়দা ও ফযীলত অনেক। দু'আটি এই–

اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ (ابو داؤد، كتاب الجنائز، باب الدعاء للمريض عند العيادة)

অর্থাৎ 'আমি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, যিনি মহান আরশের মালিক, তিনি যেন তোমাকে সুস্থ করে দেন।'

হাদীস শরীফে এসেছে, যে মুসলমান অপর মুসলমান ভাই অসুস্থ হওয়ার পর তাকে দেখতে গেলে এ দু'আটি পড়বে, তাহলে সে অসুস্থতা যদি মৃত্যুরোগ না হয়, আল্লাহ তাকে সুস্থতা দান করবেন। কিন্তু সে রোগ মৃত্যুর কারণ হলে সেটা ভিন্ন কথা।

দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করুন

হাদীসে উল্লেখিত এসব দু'আ পড়লে তিনভাবে সাওয়াব পাওয়া যাবে। প্রথমত, রোগী দেখার সময় সুন্নাতের ওপর আমল করার সাওয়াব। কারণ, এসব

দু'আর শব্দসমূহ তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এবং তিনি নিজেও অসুস্থের জন্য এ দু'আগুলো পড়তেন। দ্বিতীয়ত. এক মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে সহমর্মিতা ও দরদ প্রকাশের সাওয়াব পাওয়া যাবে। তৃতীয়ত. অসুস্থের জন্য দু'আ করার সাওয়াব পাওয়া যাবে। ছোট্ট একটি আমল অথচ এর ভেতরে রয়েছে তিন-তিনটি আমলের সাওয়াব। সুতরাং রোগীকে দেখার নিয়ত করলে এ তিনটি আমলেরও নিয়ত করে নিবে, তাহলে ইনশাআল্লাহ সবগুলোর সাওয়াব পেয়ে যাবে।

দ্বীন কাকে বলে?

স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো একটি কথা বলতেন আমাদের শায়খ হযরত ডা. আবদুল হাই (রহ.)। তিনি বলতেন, শুধু দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের নাম হলো দ্বীন। একটু দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাও, তাহলে তোমার দুনিয়াও দ্বীন হয়ে যাবে। যে কাজগুলো তোমরা সব সময় করছ, সেগুলোও তখন ইবাদতে পরিণত হবে এবং এর কারণে আল্লাহও সন্তুষ্ট হবেন। তবে শর্ত হলো, দুটি কাজ করতে হবে। প্রথমত. নিয়তের মধ্যে গড়বড় থাকতে পারবে না বরং নির্ভেজাল নিয়ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত. কাজটি সুন্নাত তরীকায় করে নাও। ব্যাস, প্রতিটি কাজে শুধু এ দুটি কাজ কর, তাহলে ওই কাজটিই দ্বীনের কাজ হয়ে যাবে।

আসলে বুযুর্গদের কাছে যাওয়ার ফায়দা এটাই। তারা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেন। চিন্তার পথ ঘুরিয়ে দেন। ফলে মানুষ কাজ-কারবার সহীহ পথে চলে এবং দুনিয়ার কাজও দ্বীনের কাজে পরিণত হয়।

রোগী দেখার সময় হাদিয়া নিয়ে যাওয়া

রোগী দেখার সময় হাদিয়া নেয়ার প্রচলন আমাদের সমাজে ব্যাপক। অনেকে এটাকে জরুরী মনে করে। কারো কারো ধারণা হলো, হাদিয়া না নিলে রোগীর বাসার লোকজন কী মনে করবে। এ জাতীয় আরো কত ভাবনা মানুষকে অস্থির করে তোলে। অবশেষে অনেকের জন্য হাদিয়া নেয়া সম্ভব হয় না এবং রোগীকে দেখারও তাওফীক হয় না। অথচ রোগী দেখার জন্য হাদিয়া নিতেই হবে– এ ধরনের কোনো বিধান ইসলামে নেই। এটি রোগী দেখার জন্য ফরয, ওয়াজিব কিংবা সুন্নাতও নয়। এটা নিছক রুসম। এ রুসমের পাল্লায় পড়ে আমরা কত বড় সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই। শয়তান মানুষকে এ রুসমের প্ররোচিত করে। আল্লাহর ওয়াস্তে রুসমটি বর্জন করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"প্রত্যেক জাতিই সাক্ষাতের শিষ্টাচার মেনে চলে। একে অপরের সঙ্গে দেখা হলে হ্যালো, গুডমর্নিং, গুডইভেনিং, নমস্কার ইত্যাদি শব্দ তারা ব্যবহার করে। এ বিষয়ে ইসলামেও রয়েছে নির্দিষ্ট শিষ্টাচার। অপরাপর জাতির মতো এক-দু'টা শব্দ ছুঁড়ে দেয়ার রীতি ইসলামে নেই। বরং এক্ষেত্রে ইসলামের শিষ্টাচার মূলত আরও অনেক উন্নত, প্রাণসম্পন্ন, অর্থবহ, সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র। আর তা হলো, সাক্ষাতের সময় 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলা।"

সালামের আদব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَصْرِ الضَّعِيْفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُوْمِ، وَاِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

(صحيح بخارى - كتاب الاستيذان باب افشاء السلام)

হামদ ও সালাতের পর।

সাতটি উপদেশ

হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযি.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন।

এক. অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা।

দুই. জানাযার পেছনে পেছনে যাওয়া।

তিন. হাঁচি দিয়ে কেউ 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে তার জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলা।

চার. দুর্বলকে সাহায্য-সহযোগিতা করা।

পাঁচ. মযলূমের সহযোগিতা করা।

ছয়. সালামের প্রচার-প্রসার করা।

সাত. কসমকারীর কসম পূর্ণ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করা।

এ সাতটি বিষয়ের মধ্য থেকে পাঁচটির আলোচনা 'আলহামদুলিল্লাহ' আমরা শেষ করেছি। ষষ্ঠ বিষয়টি হলো, সালামের প্রচার-প্রসার করা, পরস্পর দেখা হলে সালাম করা।

প্রত্যেক জাতিই সাক্ষাতের শিষ্টাচার মেনে চলে। একে-অপরের সঙ্গে দেখা হলে হ্যালো, গুডমর্নিং, গুডইভেনিং, নমস্কার ইত্যাদি শব্দ তারা ব্যবহার করে। ইসলামেও এ বিষয়ে নির্দিষ্ট শিষ্টাচার আছে। অপরাপর জাতির মত এক-দু'টা শব্দ ছুঁড়ে দেয়ার রীতি ইসলামে নেই। বরং এক্ষেত্রে ইসলামের শিষ্টাচার মূলত অন্যান্য জাতির সংস্কৃতি থেকে আরও অনেক উন্নত, প্রাণসম্পন্ন, অর্থবহ, সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্দিষ্ট পন্থা হলো, 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলা।

সালামের উপকারিতা

কারো সঙ্গে দেখা হলে যদি তাকে 'হ্যালো' বলা হয়, তবে এর দ্বারা কী উপকারিতা হয়? এতে না আছে দুনিয়ার ফায়দা, না আছে আখেরাতের ফায়দা। কিন্তু এরই বিপরীতে যদি কেউ সালামের এ শব্দগুলো বলে– আস্-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি, যার অর্থ হলো, তোমার ওপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক– তাহলে এরই মাধ্যমে আপনি এক মুসলমান ভাইয়ের জন্য তিনটি দু'আ করলেন। এক. শান্তির দু'আ, দুই. রহমতের দু'আ, তিন. বরকতের দু'আ।

অনুরূপভাবে সালামের পরিবর্তে গুডমর্নিং-সুপ্রভাবত, গুডইভেনিং-শুভসন্ধ্যা বললে যদি ধরে নেয়াও হয় যে, এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দু'আ, তাহলেও এ দু'আতো শুধু সকাল কিংবা সন্ধ্যার ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকলো।

অথচ ইসলামের সালাম-রীতি কত সুন্দর, কতই না অর্থবহ। একবার যদি সালামের দু'আগুলো কবুল হয়, তাহলে সমূহ কলুষতা আমাদের অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা পদচুম্বন করবে। এ মহান নেয়ামত অন্যান্য জাতির সম্ভাষণ পদ্ধতিতে কখনও পাবেন। এ বৈশিষ্ট্য ইসলামের এবং শুধুই ইসলামের।

সালাম আল্লাহর দান

হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)কে সৃষ্টি করে বললেন, যাও, অমুক স্থানে ফেরেশতাদের একটি দল বসে আছে। তাদেরকে সালাম করো। আদম (আ.) গিয়ে 'আস-সালামু আলাইকুম' বলে ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে সালাম দিলেন। ফেরেশতারা ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে উত্তর দিলো। অর্থাৎ– 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' তারা অতিরিক্ত বললো। (বুখারী শরীফ)

সুতরাং প্রতীয়মান হলো, সালাম আল্লাহপ্রদত্ত এক মহা নেয়ামত। এত বড় নেয়ামত, যা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অথচ এ মহান নেয়ামতকে ছেড়ে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে 'গুডমর্নিং' আর 'গুডইভেনিং' শিক্ষা দিচ্ছি, এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে!

সালামের প্রতিদান

'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' পুরাটা বলাই হলো সর্বোত্তম পদ্ধতি। তবে শুধু 'আস-সালামু আলাইকুম' বললেও সালাম হয়ে যাবে। হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন– 'দশ'। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে সালাম দিলো– আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম উত্তর দেয়ার পর বললেন– 'বিশ'। কিছুক্ষণ পর তৃতীয় ব্যক্তি এলো এবং 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলে সালাম পেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেয়ার পর বললেন– 'ত্রিশ'।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো, শুধু 'আস-সালামু আলাইকুম' বললে দশ নেকী এবং ওয়া বারাকাতুহু' পর্যন্ত পুরাটা বললে ত্রিশ নেকী পাওয়া যায়। যদিও শুধু আস-সালামু আলাইকুম' দ্বারা সুন্নাত আদায় হয়ে যায়, কিন্তু নেকী পাওয়া যায় তুলনামূলক কম। দেখুন, উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, সালামে দু'আ রয়েছে, নেকীও রয়েছে।

স্পষ্ট শব্দে সালাম বলতে হবে। শব্দ বিগড়ানো যাবে না, কিংবা পরিবর্তনও করা যাবে না। অনেকে স্পষ্ট করে সালাম দিতে জানে না। তাই এ দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সালামের সময় নিয়ত করবে

এখানে আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় রয়েছে। তাহলো সালামের যে শব্দমালা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পেয়েছি, সেখানে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ তথা শব্দটি বহুবচনসহ রয়েছে। এক বচনের ব্যবহার তথা اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ বলা হয়নি। প্রথমটির অর্থ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর দ্বিতীয়টির অর্থ– তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এর কারণ হলো, মূলত আরবী ভাষার নীতিমালা মতে এটি দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির প্রতি সম্মান জানানো হয়েছে। অর্থাৎ আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

কোনো কোনো আলেম এর আরেকটি কারণও উল্লেখ করেছেন। তাহলো, মূলত আস-সালামু আলাইকুম-এর মাধ্যমে সম্বোধন করা হয় তিনজনকে।

প্রথমত. যাকে সালাম দেয়া হয়েছে, তাকে এবং সে ছাড়াও তাঁর সঙ্গে 'কিরামান-কাতিবীন' যে দু'জন ফেরেশতা রয়েছে, তাদের উভয়কে। এদের একজন লিখেন মানুষের নেক আমলগুলো, আর দ্বিতীয়জন লিখেন খারাপ আমলগুলো। অতএব, সালাম দেয়ার সময় এই দুই ফেরেশতার নিয়তও করবে। তাহলে এর মাধ্যমে তিনজনকে সালাম দেয়ার সাওয়াব ইনশাআল্লাহ তুমি পেয়ে যাবে।

আর ফেরেশতাদের নিয়ত দ্বারা আরেকটি ফায়দা হলো, তারা তো তোমার সালামের উত্তর অবশ্যই দিবে, এভাবে তুমি নিষ্পাপ দু'জন ফেরেশতারও দু'আর অংশীদার হয়ে যাবে।

নামাযের সালাম ফেরানোর সময় নিয়ত

এ কারণেই বুযুর্গগণ বলে থাকেন, নামাযের সালামের সময় যখন ডান দিকে ফিরবে, তখন ডানের সকল মুসলমান ও ফেরেশতার নিয়ত করবে। অনুরূপভাবে বাম দিকে ফেরার সময় বামের সকল মুসলমান ও ফেরেশতার নিয়ত করবে। ফেরেশতারা তো তোমার সালামের উত্তর অবশ্যই দিবে। ফলে তুমি তাদের দু'আর অংশীদার হবে। অথচ খামখেয়ালী করে আমরা এ নিয়ত করি না এবং এক মহান ফায়দা ও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই।

উত্তর হবে সালাম থেকে বেশি

সালাম দেয়া সুন্নাত। জবাব দেয়া ওয়াজিব। যে আগাম সালাম দিবে, সে অধিক সাওয়াবের অধিকারী হবে। আল্লাহ বলেছেন–

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا

অর্থাৎ– কেউ তোমাকে সালাম দিলে, তার উত্তরে তুমি একটু বাড়িয়ে বলবে; কিংবা অন্তত সমান সমান বলবে। যেমন কেউ যদি 'আস-সালামু আলাইকুম' বলে, উত্তরে তুমি 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলবে অথবা কমপক্ষে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলবে।

যেসব স্থানে সালাম নিষেধ

কিছু জায়গায় সালাম দেয়া জায়েয নেই। যেমন কেউ হয়ত দ্বীনের আলোচনায় ব্যস্ত, লোকজনও তার আলোচনা শোনার মাঝে মত্ত, তাহলে এ অবস্থায় আগন্তুক সালাম দিতে পারবে না। বরং সালাম দেয়া ছাড়াই চুপচাপ মজলিসে বসে পড়বে। অনুরূপভাবে তেলাওয়াত রত এবং যিকিরে মগ্ন ব্যক্তিকেও সালাম দেয়া যাবে না। সারকথা হলো, কেউ যদি কোনো কাজে ব্যস্ত

থাকে, আর সালামের কারণে যদি সেই কাজে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় সালাম না দেয়া উচিত।

অন্যের মাধ্যমে সালাম পাঠানো

অনেক সময় একে অপরের কাছে কারো মাধ্যমে সালাম পাঠায়, তখন এটাও সালামই হবে। এরূপ সালাম পাঠানোর দ্বারা সালামের ফযীলত অর্জিত হবে। তবে উত্তর দিতে হবে এভাবে- عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ অর্থাৎ- সালাম প্রেরণকারী এবং সালাম বাহক উভয়ের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

এ উত্তরের মাধ্যমে দুই সালাম এবং দুই দু'আর সাওয়াব পাওয়া যাবে।

অনেকে এক্ষেত্রে শুধু وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ বলে। এর দ্বারা সালামের উত্তর আদায় হবে ঠিক, তবে এটা সম্পূর্ণ সঠিক পদ্ধতি নয়।

লিখিত সালামের উত্তর

চিঠির শুরুতে অনেক সময় সালামের শব্দগুলো লিখে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে কোনো কোনো আলেম বলেন, যেহেতু সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব, বিধায় চিঠির উত্তর দেয়াও ওয়াজিব।

অন্যদিকে কেউ কেউ বলেছেন, সালাম সম্বলিত এ জাতীয় চিঠির উত্তর দেয়া ওয়াজিব নয়। কেননা, চিঠির উত্তর পাঠাতে হলে টাকার প্রয়োজন আছে। অনেকের টাকা খরচ করার মতো অবস্থা নাও থাকতে পারে। তাই লিখিত সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব না হলেও মুস্তাহাব অবশ্যই। তবে মাসআলা হলো, চিঠিতে যখনই সালাম পড়বে, তখন উত্তর দেয়া ওয়াজিব হবে। সালামের উত্তর যদি লিখিত দেয়া হয়, কিংবা অন্তত মুখেও না দেয়া হয়, তাহলে ওয়াজিব ত্যাগকারীর গুনাহ পাবে। অথচ এ বিষয়টি সম্পর্কে আমরাও কতই উদাসীন। না জানার কারণে একটি 'ওয়াজিব' আমরা পালন করছি না।

অমুসলিমকে সালাম দেয়া

ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, কাফিরকে সালাম দেয়া জায়েয নেই। কোনো অমুসলিমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আর সালাম দেয়ার প্রয়োজন হলে, সেই শব্দই ব্যবহার করবে, যা তারা এ জাতীয় মুহূর্তে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কোনো অমুসলিম যদি সালাম দিয়ে দেয়, তাহলে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' পুরাটা না বলে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বলবে এবং মনে মনে এ দু'আ করবে যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে হেদায়াত ও ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দান করুন।

এর কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে মদীনা এবং তার আশপাশের এলাকাগুলোতে প্রচুর ইয়াহুদী বাস করতো। ইয়াহুদীরা সকল যুগের জন্যই

ছিলো দুষ্ট প্রকৃতির। রাসূল (সা.) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম যদি তাদের সামনে পড়তো, তখন তারা 'আস-সামু আলাইকুম' বলতো অর্থাৎ 'লাম' অক্ষরটিকে মাঝখান থেকে ফেলে দিতো। এতে অনেক সময় শ্রোতা তাদের চতুরতা বুঝে ওঠতো না। শ্রোতা মনে করতো যে, 'আস-সালামু আলাইকুম'ই বলেছে।

'আস-সাম' আরবী শব্দ, যার অর্থ– মৃত্যু, ধ্বংস। সুতরাং 'আস-সামু আলাইকুম' অর্থ– তোমার মৃত্যু হোক কিংবা তুমি ধ্বংস হও। কিছুদিন পর সাহাবায়ে কেরাম ইয়াহুদীদের এ চালাকি বুঝে ফেলেন এবং তাদের সালাম প্রত্যাখ্যান করেন। (বুখারী শরীফ)

এক ইয়াহুদীর সালাম

এক দিনের ঘটনা। ইয়াহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসে এবং 'আস-সামু আলাইকুম' বলে তাদের ধূর্তামির পুনরাবৃত্তি করে। হযরত আয়েশা (রাযি.) বিষয়টি বুঝে ফেলেন এবং ক্ষোভ মিশ্রিত কণ্ঠে উত্তর দেন– 'আলাইকুমুস সাম ওয়াললা'নাহ' অর্থাৎ ধ্বংস ও অভিসম্পাত তোমাদের ওপর পড়ুক।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশেয়া (রাযি.)-এর এ উত্তর শুনে তাকে বারণ করে বললেন–

مَهْلاً يَا عَائِشَةَ

'থামো আয়েশা! কোমলতা দেখাও।'

তারপর বললেন–

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ

'আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ব্যাপারে কোমলতা পছন্দ করেন।'

হযরত আয়েশা (রাযি.) উত্তর দিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কত বড় গোস্তাখি। তারা আপনাকে উদ্দেশ্য করে 'আস-সামু আলাইকুম' বলছে, ধ্বংসের দু'আ করছে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আয়েশা! আমি তাদেরকে কী উত্তর দিয়েছি, তাকি তুমি শুনতে পাওনি? যখন তারা 'আস-সামু আলাইকুম' বলেছে, আমি উত্তরে শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বলেছি। যার অর্থ– তোমরা যে বদদু'আ আমার জন্য করছো, আল্লাহ তাআলা সেটাকে তোমাদের জন্য করে দিন।' তারপর তিনি আরো বললেন–

يَا عَائِشَةُ! مَا كَانَ الرِّفْقُ فِىْ شَىْءٍ اِلَّا زَانَهُ وَلَا نُزِعَ عَنْ شَىْءٍ اِلَّا شَانَهُ

(صحيح البخارى، كتاب الاستئذان)

'শোনো আয়েশা! কোমলতা শুধুই শোভা বৃদ্ধি করে। আর কোমলতা বর্জন কেবল ত্রুটিযুক্ত করে।'

কোমলতার সর্বাত্মক চেষ্টা

উক্ত হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করুন। ইয়াহুদীরা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বেয়াদবী করেছে আর আয়েশা (রাযি.) তার উত্তর যতটুকু দিয়েছেন বাহ্যত তা ইনসাফ পরিপন্থী ছিল না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটুকু কঠোরতাও বর্জন করতে বললেন। এর পরিবর্তে কোমলতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিলেন। কারণ, এটাই হচ্ছে তাঁর সুন্নাত। সুতরাং বোঝা গেলো, প্রতিটি বিষয়ে যথাসম্ভব কোমলতা প্রদর্শন প্রতিজন মানুষ থেকে কাম্য।

হযরত মারুফ কারখী (রহ.)-এর অবস্থা

হযরত মারুফ কারখী (রহ.)। আল্লাহর এক মহান ওলী ছিলেন। জুনাইদ বাগদাদী (রহ.)-এর দাদা-পীর। জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) ছিলেন হযরত সিররী সাকতী (রহ.)-এর খলীফা। আর সিররী সাকতী (রহ.)-এর খলীফা ছিলেন হযরত মারুফ কারখী (রহ.)। এ মহান বুযুর্গ সব সময় যিকিরের মধ্য দিয়ে সময় কাটাতেন। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি যিকির ত্যাগ করেননি। এমনকি একবার এক নাপিত তাঁর গোঁফ কাটছিলো। তখনও তিনি যিকির করছিলেন। নাপিত বললো, হযরত! কিছুক্ষণের জন্য থামুন। গোঁফটা কেটে দিই, তারপর আবার শুরু করুন। তিনি উত্তর দিলেন, তোমার কাজ তো তুমি করছো, আমার কাজ কি আমি বন্ধ রাখবো? এ ছিলো তাঁর অবস্থা। যিকিরই ছিলো তার নাওয়া-খাওয়া।

তাঁর একটি ঘটনা

একদিন তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি পানি পরিবেশন করছে এবং লোকজনকে এ বলে তার দিকে আহ্বান করছে যে, 'যে বান্দা আমার কাছ থেকে পানি পান করবে, আল্লাহ তার ওপর রহম করুন।' হযরত মারুফ কারখী (রহ.) এ আহ্বান শুনে ওই ব্যক্তির কাছে গেলেন এবং এক গ্লাস পানি নিয়ে পান করলেন।

এ ঘটনা যখন তাঁর সাথী দেখলো, তখন খুব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'হযরত! আপনি তো রোযা রেখেছিলেন!।' তিনি উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর এ বান্দা দু'আ করছে, এমনও তো হতে পারে, তার দু'আ কবুল হয়ে গেছে। তাই তার দু'আর ভাগী হওয়ার জন্য তার থেকে পানি নিলাম এবং রোযা ভেঙে ফেললাম। চিন্তা করলাম, এটা তো নফল রোযা। পরেও এর কাযা করা যাবে। কিন্তু এ ব্যক্তির দু'আর ভাগী হওয়ার সুযোগ তো আর পাবো না।'

একটু ভাবুন। এত বড় ওলী, এত বড় সুফী, একটি দু'আর জন্য নফল রোযা ভেঙেছেন।

অনুরূপভাবে সালামও একটি দু'আ। এটার জন্য আমাদেরকে আরো আন্তরিক হতে হবে।

ধন্যবাদ নয়, 'জাযাকুমুল্লাহ' বলবে

ইসলামে এজন্যই দু'আর এত গুরুত্ব। ইসলাম প্রতিটি কাজে দু'আর শিক্ষা দিয়েছে। যেমন হাঁচিদাতার জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ অর্থাৎ– আল্লাহ তোমাকে রহম করুন, সাক্ষাতের সময় اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ– আল্লাহ তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত করুন।' কেউ তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে جَزَاكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ তোমায় প্রতিদান দিন– এসবই যথাসময়ে বলা ইসলামের শিক্ষা। অথচ বর্তমানে কারো কাছ থেকে ভালো কিছু পেলে আমরা বলি– ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অর্থ একজনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। এটা গুনাহর বিষয় নয়। বরং হাদীসে এসেছে–

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللّٰهَ

যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করবে না। তবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, তার জন্য جَزَاكُمُ اللّٰهُ বলে দু'আ করা। দু'আ না করে যদি তাকে 'ধন্যবাদ, শুকরিয়া' ইত্যাদি বলা হয়, তাহলে এতে তার কী ফায়দা হবে? তাই এসব দু'আর ওপর আমল করা উচিত এবং শিশুদেরকেও কচি বয়স থেকেই এসব শেখানো উচিত।

সালাম উচ্চৈঃস্বরে দেওয়া

এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, সালামের জবাব উচ্চৈঃস্বরে দেবো, না কি নিম্নস্বরে দিবো? এর উত্তর হলো, এমনিতে তো সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব। তবে অন্তত এতটুকু আওয়াজে সালাম দেওয়া সুন্নাত ও মুস্তাহাব, যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়। আর একেবারে নিম্নস্বরে দিলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তাই অন্তত এতটুকু আওয়াজে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবে যে, যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়।

আল্লাহ তাআলা এসব কথার ওপর আমল করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"চরম ভালোবাসার পরম আবেগ নিয়ে নির্বুদ্ধিতার যে রক্তিম চিত্র অঙ্কিত হয়, দ্বীন-ধর্মের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। মহব্বত তাকেই বলে, যার মাধ্যমে প্রিয়তমের শান্তি লাভ হয়। এজন্য মুসাফাহা করার সময়ও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সময় ও পরিবেশ মুসাফাহার উপযোগী কিনা? মুসাফাহার মাধ্যমে মহব্বত প্রকাশ যেন প্রিয় ব্যক্তির বিরক্তির 'কারণ' না হয়, এ সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।"

মুসাফাহার আদব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهٗ، لَا يَنْزَعُ يَدَهٗ عَنْ يَدِهٖ، حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِيْ يَنْزَعُ - وَلَا يُصَرِّفُ وَجْهَهٗ، حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِيْ يَنْزَعُ - وَلَا يُصَرِّفُ وَجْهَهٗ، حَتّٰى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِيْ يُصَرِّفُهٗ، وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيْسٍ لَهٗ (ترمذی - کتاب القیامه، باب نمبر ٤٦)

হামদ ও সালাতের পর।

হযরত আনাস (রাযি.) ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বিশেষ খাদেম

আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.), যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বিশিষ্ট সাহাবী। আল্লাহ তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত নবীজীর খেদমত করেছেন। দিন-রাত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর মা উম্মে সুলাইম তাঁকে শিশুকালেই রেখে গিয়েছিলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে। কৈশোর ও যৌবনের অনেকগুলো দিন তাঁর এখানেই কেটেছিলো। তিনি নিজে কসম করে বলেন, আমি একটানা দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছি, কখনও তিনি আমাকে ধমক দেননি, মারেননি এবং জিজ্ঞেস

করেননি যে, 'এটা কেন করলে আর এটা কেন করলে না?' এত আদর দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লালন-পালন করেছেন।

(তিরমিযী, হাদীস নং ২০১৬)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ

আনাস (রাযি.) আরো বলেছেন, এক দিনের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোনো কাজে বাইরে পাঠালেন। পথিমধ্যে আমি দেখলাম, কয়েকটি শিশু খেলাধুলা করছে। আমিও তাদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে গেলাম। একথা ভুলে বসেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটা কাজে পাঠিয়েছেন। এভাবে যথেষ্ট সময় চলে গেলো। তারপর হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেলো। ঘরে এসে দেখি, ওই কাজটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আঁলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই করে নিয়েছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেসই করলেন না যে, তোমাকে কাজে পাঠিয়েছিলাম, তুমি কোথায় ছিলে?

(মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২৩০৯)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর ফল

খেদমত করাকালীন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যথেষ্ট দু'আও নিয়েছেন। যখন তিনি কোনো খেদমত করতেন, তখনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দু'আ করতেন। একবার তো এক অন্য রকম দু'আ তিনি পেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তার বয়সে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে বরকত দান করুন।' দু'আটি এমনভাবে কবুল হয়েছিলো যে, তার ফলে তিনি প্রায় সকল সাহাবার শেষে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। অসংখ্য মানুষের তাবেয়ী হওয়ার সৌভাগ্য একমাত্র তাঁর উসিলাতেই হয়েছে। তাঁকে দেখে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে অনেকেই তাবেয়ী হয়েছেন। যদি তিনি না থাকতেন, তবে এরা তো তাবেয়ী হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হযরত আনাস (রাযি.)-এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছেন অবশ্যই। ইমাম আমাশ (রহ.)ও তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছেন। যার কারণে তিনিও তাবেয়ী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন। এত দীর্ঘ জীবন তিনি পেয়েছিলেন। সন্তান-সন্ততির বরকতও এত বেশি হয়েছিলো যে, তিনি নিজেই বর্তমানে আমার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনির সংখ্যা একশ' থেকে অধিক হয়ে গিয়েছে।

হাদীসের অর্থ

আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিলো, কোনো ব্যক্তি এগিয়ে এলে মুসাফাহা করতেন। ওই ব্যক্তি হাত না

সরানো পর্যন্ত তিনি নিজের হাত সরাতেন না এবং চেহারা না ফেরানো পর্যন্ত তিনিও মুখ ফেরাতেন না। সঙ্গে উপবিষ্ট লোকদের সামনে হাটুদ্বয় ছড়িয়ে বসতেন না।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি গুণ বর্ণিত হয়েছে। এক. বিশাল মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অভ্যাস ছিলো, মুসাফাহা করার সময় নিজের হাত প্রথমে সরাতেন না। দুই. নিজের মুখ প্রথমে ঘুরিয়ে নিতেন না, বরং সাক্ষাতপ্রার্থী ব্যক্তি মুখ ফিরালে তারপর তিনি মুখ ঘোরাতেন। তিন. উপস্থিত লোকজনের সামনে পা ছড়িয়ে বসতেন না। এ তিনটি গুণের প্রতিটি গুণই ছিলো মূলত তাঁর অপূর্ব বিনয়ের এক ঝলক প্রকাশ।

অন্য হাদীসে এসেছে, কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তিনি তার কথা শুনতেন। কথার মাঝখান থেকে কথা কাটতেন না এবং সে ওঠে যাওয়া পর্যন্ত তার কথার প্রতি মনোযোগী থাকতেন। যে কেউ এমনকি সাধারণ বৃদ্ধলোকও তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতো। প্রয়োজনে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গে করেও নিয়ে যেতে পারতো।

প্রকৃতপক্ষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি সুন্নাতই আমাদের জন্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সুন্নাতের ওপর আমল করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন। কথা হলো, কিছু সুন্নাতের ওপর আমল করা সহজ, আর কিছুর ওপর আমল করা কঠিন।

আলোচ্য হাদীসে যে সুন্নাতটির আলোচনা এসেছে, তাহলো মুসাফাহাকারীর হাত সরানো পর্যন্ত তিনিও ধরে রাখতেন, অন্যের কথা কেটে দিতেন না, অপরের কথা মনোযোগসহ শুনতেন, অপর ব্যক্তি না যাওয়া পর্যন্ত তিনিও মনোযোগী থাকতেন।

একজন ব্যস্ত মানুষের জীবনে আমল আসলেই কঠিন। কারণ, সব মানুষ তো এক নয়। কেউ কেউ সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে, কথা বলার সময় অপরের ব্যস্ততার প্রতিও নজর রাখে। কিন্তু আঁঠা জাতীয় কিছু লোক আছে, যাদের কাছে এসব কিছুর কোনো গুরুত্ব নেই; এসেছে তো এসেছে, যাওয়ার কোনো নাম নেয় না, কথা বলা শুরু করে তো করেই বন্ধ করার প্রয়োজনও মনে করে না। এরূপ সুইংগাম-মার্কা লোকের কথা মনোযোগসহ শুনে যাওয়া, তার কথা না কাটা, তার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দেয়া বিরাট কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে যিনি এক মহান যিম্মাদারী নিয়ে এসেছেন, জিহাদ, তালীম, তরবিয়ত, দাওয়াত সব সময় দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর মতো ব্যক্তির জন্য উক্ত আমল অবশ্যই আরো কষ্টদায়ক। তবুও তিনি করেছেন, বস্তুত এটা তাঁর মুজিযা ছাড়া কিছু নয়, এটা তাঁর বিনয়েরই আলামত।

উভয় হাতে মুসাফাহা করা

উক্ত হাদীসের প্রথম বাক্য থেকে দুটি মাসআলা আমরা জানতে পেরেছি। এক. সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করা সুন্নাত। মুসাফাহার পদ্ধতি কী হবে, এ সম্পর্কে হাদীসে যদিও কোনো বিবরণ নেই; কিন্তু বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, উভয় হাতে মুসাফাহা করাই সুন্নাতের অধিক অনুকূলে। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারীর মুসাফাহার অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর সঙ্গে মুসাফাহা করেছেন উভয় হাত দ্বারা। সম্ভবত ইমাম বুখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর বক্তব্যও এনেছেন যে, তিনি বলেছেন– মানুষ যখন মুসাফাহা করবে, তখন উভয় হাত দ্বারা যেন মুসাফাহা করে।

হ্যান্ডশেক করা সুন্নাত পরিপন্থী

বর্তমানে এক হাতে মুসাফাহা করা এক প্রকার ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা মূলত ইংরেজরা সর্বপ্রথম চালু করেছে। অথচ কিছু কট্টরপন্থী বিশেষ করে সৌদি আরবের মানুষ বলে থাকে, মুসাফাহা এক হাতে করা সুন্নাত। জেনে রাখুন, তাঁদের এ বক্তব্য ভুল। কেননা, হাদীস শরীফে যেমনিভাবে এক বচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তেমনিভাবে দ্বিবচনের শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। আর বুযুর্গানে দ্বীন এর রহস্য উদঘাটন করেছেন এভাবে যে, উভয় হাত দ্বারা মুসাফাহা করা সুন্নাত। কোনো হাদীসেই সরাসরি এটা আসেনি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের মাধ্যমে মুসাফাহা করেছেন। অপর দিকে বিভিন্ন হাদীসে স্পষ্ট এসেছে যে, তিনি উভয় হাত দ্বারা মুসাফাহা করেছেন। বুযুর্গানে দ্বীন থেকেও এ রকম আমলই প্রমাণিত। তাই উলামায়ে কেরাম উভয় হাতের মাধ্যমে মুসাফাহা করাকেই সুন্নাত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'আত-তাহিয়্যাত' এমনভাবে মুখস্থ করিয়েছেন যে, كَفِّىْ بَيْنَ كَفَّيْهِ আমার হাত তার উভয় হাতের মাঝে ছিলো।' এতেও প্রমাণিত হয়, উভয় হাত দ্বারা মুসাফাহা করারই প্রচলন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ছিলো।

তবে এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে, যদি কেউ এক হাত দ্বারা মুসাফাহা করে, তাহলে সে হারাম কাজ করেছে বলা যাবে না। বরং বলা হবে, সে সুন্নাতের অনুকূল আমল ত্যাগ করেছে।

পরিবেশ দেখে মুসাফাহা করবে

আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে আমরা আরেকটি মাসআলাও জানলাম, যে মুসাফাহা করা অবশ্যই সুন্নাত। তবে প্রতিটি সুন্নাতেরই একটা স্থান-কাল থাকে। সুন্নাতটি যথাযথ স্থানে আদায় করতে পারলে সুন্নাত বিষয়ে পরিগণিত হবে এবং এর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ সাওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই সুন্নাতকেই যদি স্থান-কাল-পাত্র না বুঝে কার্যকর করা হয়, তাহলে সাওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন কারো সঙ্গে মুসাফাহা করতে গেলে যদি সামনের ব্যক্তি কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে মুসাফাহা করা জায়েয নেই। এমতাবস্থায় শুধু মুখে সালাম বলবে।

এটা মুসাফাহার স্থান নয়

যেমন এক ব্যক্তির উভয় হাত ব্যস্ত কিংবা মাল-সামানা বা অন্য কিছু দ্বারা তার উভয় হাত আবদ্ধ, আর এক ব্যক্তি তার সঙ্গে মুসাফাহা করতে চাচ্ছে, তাহলে এটা কিন্তু মুসাফাহার স্থান হলো না। বরং এর কারণে লোকটির হাতের জিনিসপত্র এক জায়গায় রাখতে হবে, তারপর মুসাফাহা করতে পারবে। তখন এটা তো তাকে কষ্ট দেয়া হলো। তখন এর কারণে গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনাও বিদ্যমান। বর্তমানে মানুষ এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখে না।

মুসাফাহার উদ্দেশ্য

মুসাফাহা মানে মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ। আর মহব্বতের বহিঃপ্রকাশের জন্য সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করা উচিত, যে পদ্ধতিতে প্রিয়জন খুশি হবে। অনেক সময় দেখা যায়, আল্লাহওয়ালা কোনো বুযুর্গ কোথাও গেলে মানুষের উপচে পড়া ভিড় লেগে যায় তাঁর সঙ্গে মুসাফাহা করার উদ্দেশ্যে। অথচ হয়ত ওই বেচারা বুযুর্গ একজন বৃদ্ধ মানুষ। এতে তাঁর কষ্ট হয়। আসলে এগুলো আমাদের অহেতুক চিন্তা। বুযুর্গের মুসাফাহা থেকে যেন বরকত নিতেই হবে– এ জাতীয় চিন্তায় আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে এরূপ করি। মূলতঃ এটা তো মুসাফাহার আদব নয়।

এ সময়ে মুসাফাহা করা গুনাহ

বিশেষত বাংলাদেশ ও বার্মায় এর প্রবণতা অধিক দেখা যায়। তারা মনে করে, বুযুর্গের সঙ্গে মাহফিল শেষে মুসাফাহা না করলেই নয়। আব্বাজান মুফতী শফী (রহ.) যখন প্রথমবার বাংলাদেশে গিয়েছিলেন, তখন এ দৃশ্য দেখা গেছে। মাহফিলে হাজার হাজার লোক এসেছিলো। মাহফিল শেষে সবাই মুসাফাহার উদ্দেশ্যে তাঁর ওপর উপচে পড়লো। এমনকি আব্বাজানকে সেখান

থেকে বের করা কষ্টকর হয়ে পড়লো। আসলে এটা মূলত মুসাফাহার আদব নয় বরং লোকজনকে কষ্ট দেয়ার গুনাহ নিজের কাঁধে নিতে হয়।

এটা তো শত্রুতা

হযরত থানবী (রহ.) রেঙ্গুনের সূরতি মসজিদে একটি মাহফিলে ওয়াজ করেছিলেন। মাহফিল শেষে লোকজনের এতই ভিড় ছিলো যে, তিনি কয়েকবার পড়তে পড়তে ওঠে গেছেন। আসলে এটা বাস্তবিক মহব্বত নয়, বরং শুধু বাহ্যিক মহব্বত। কারণ, মহব্বতের জন্য প্রয়োজন বিবেক-বুদ্ধির। বিবেকহীন মহব্বতে সমবেদনা থাকে না।

অতিরঞ্জিত ভক্তির একটি ঘটনা

হযরত থানবী (রহ.)-এর 'মাওয়ায়েযে'-এ একটি ঘটনা লেখা হয়েছে। এক বুযুর্গ কোনো এক অঞ্চলে সফরে গিয়েছিলেন। বুযুর্গের প্রতি ওই অঞ্চলের লোকদের এত ভক্তি সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, বুযুর্গকে অন্য কোথাও যেতে দেয়া হবে না, এ এলাকাতেই রেখে দেবে। তারা তাঁর বরকত লাভে জন্য হবে। এ শুভ চিন্তাটি বাস্তবায়নের জন্য তাদের মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে যে, বুযুর্গকে হত্যা করে এখানে দাফন করতে হবে। তবেই তার বরকত এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

চরম ভালোবাসার পরম আবেগ নিয়ে নির্বুদ্ধিতার যে রক্তিম চিত্র অঙ্কিত হয়, দ্বীন-ধর্মের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না। মহব্বত তাকেই বলে, যার কারণে প্রিয়তমের শান্তি লাভ হয়। তেমনি মুসাফাহা করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সময়টা মুসাফাহা করার জন্য উপযোগী কিনা? এ ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক থাকা দরকার। উভয় হাত যদি ব্যস্ত থাকে, তখন আরাম ও বিশ্রামের নিয়তে মুসাফাহাকে উপেক্ষা করার মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ অধিক সাওয়াব লাভ হবে।

মুসাফাহা দ্বারা গুনাহ ঝরে যায়

এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'এক মুসলমান যখন অপর মুসলমানের সঙ্গে মহব্বতের সাথে মুসাফাহা করে, আল্লাহ তখন উভয় হাতের গুনাহগুলো ঝেড়ে ফেলে দেন।'

সুতরাং মুসাফাহা করার সময় এ নিয়ত করবে যে, আল্লাহ যেন এ মুসাফাহার মাধ্যমে আমার আর তার গুনাহগুলো মাফ করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়তও করবে যে, আল্লাহর এ বান্দা আমার সঙ্গে মুসাফাহা করছে, তার হাতের বরকত যেন আমার কাছে সঞ্চারিত হয়। বিশেষ করে আমরা অনেক সময় এমন

এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, যেমন ওয়াজ-নসীহতের পর মানুষ মুসাফাহা করতে ভিড় করে। এ ধরনের পরিস্থিতির ব্যাপারে ডা. আবদুল হাই বলতেন, ভাই! অনেকে যখন আমার সঙ্গে মুসাফাহা করার জন্য এসে ভিড় করে, তখন আমি আনন্দিত হই। ভাবি, এরা সকলেই আল্লাহর নেককার বান্দা। কিছুই জানা নেই, কোন লোকটি আল্লাহর প্রিয় মকবুল বান্দা। যখন ওই মকবুল বান্দার হাত আমার হাতকে স্পর্শ করে যাবে, তখন হয়ত তার বরকতে আল্লাহ তাআলা আমার প্রতিও তাঁর দয়া বর্ষণ করবেন।

এসব কথা শিখতে হয় বুযুর্গদের কাছ থেকে। কারণ, যখন অনেক লোক মুসাফাহা করতে উপস্থিত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষের আত্মগৌরব ফুলে ওঠার সম্ভাবনা থাকে এবং মাথায় এ চিন্তা ঘুরপাক খায় যে, এত মানুষ যখন আমার সঙ্গে মুসাফাহা করছে এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করছে, তাহলে বাস্তবেই আমি একজন বুযুর্গ হয়ে গেছি। পক্ষান্তরে মুসাফাহার সময় যদি নিয়ত করে নেয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা হয়ত তার বরকত দ্বারা আমাকেও সিক্ত করবেন, আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। তাহলে তো দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণরূপেই পরিবর্তন হয়ে গেলো। ফলে এখন মুসাফাহা করার কারণে অহংকার ও আত্মগৌরব সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে বিনয় সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং মুসাফাহা করার সময় নিয়তের দিকটাও খেয়াল রাখতে হবে।

মুসাফাহা করার একটি আদব

হাদীসের বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয়, মুসাফাহার একটি আদব হলো, তুমি প্রথমে হাত সরাবে না। কেননা, হাত সরালে হয়তো তোমার সঙ্গে সাক্ষাতকারী এ কথা মনে করতে পারে যে, তুমি তার সঙ্গে মুসাফাহা করতে আগ্রহী নও অথবা তাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখছো। বিধায় আগ্রহের সঙ্গে মুসাফাহা করবে। তবে কেউ যদি তোমার হাত এমনভাবে জড়িয়ে রাখে যে, ছাড়ানোর কোনো নাম-গন্ধও নেই, তখন প্রথমে হাত সরানোর অবকাশ অবশ্যই আছে।

সাক্ষাতের একটি আদব

উক্ত হাদীসে এও বলা হয়েছিল যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষাতকারীর সঙ্গে যখন কথা বলতেন, তখন সাক্ষাতকারী মুখ না ফিরানো পর্যন্ত তিনিও মুখ ফিরাতেন না; বরং আগ্রহভরে শুনে যেতেন। এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। এর ওপর আমলও নিশ্চয় কষ্টকর। তবুও আমল করার পুরোপুরি চেষ্টা করতে হবে। সাক্ষাতকারীকেও অবশ্য সাক্ষাতদাতার সময়ের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি।

একটি চমৎকার ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে দেখার জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন আসতে লাগলো। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— مَنْ عَادَ مِنْكُمْ فَلْيُخَفِّفْ 'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে যেন অল্প সময়ে সেরে ফেলে।' কেননা, অনেক সময় অসুস্থ ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন হয় নির্জনতার। মানুষের উপস্থিতিতে রোগী অনেক ক্ষেত্রে অস্বস্তিবোধ করে। তাই তার কাছে বেশি সময় না থেকে সংক্ষিপ্তভাবে দেখা-শোনা করে চলে আসাটাই বাঞ্ছনীয়।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর কথা বলছিলাম। অসুস্থ হয়ে তিনি বিছানায় পড়ে আছেন। এক ব্যক্তি তাকে দেখতে এলো এবং বসে পড়লো। সে এমনভাবে বসে থাকলো যে, ওঠার যেন নামও সে নিচ্ছে না। ইতোমধ্যে অনেক মানুষের দেখা-সাক্ষাত শেষ হয়ে গিয়েছে, সকলেই যে যার পথে চলে গিয়েছে, কিন্তু এ ব্যক্তি ঠায় বসে আছে। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক মনে মনে চাচ্ছিলেন, লোকটি উঠে যাক, তাহলে আমি নিজের কিছু একান্ত কাজ করতে পারবো, এখন প্রয়োজন সম্পূর্ণ একাকিত্বের। কিন্তু না, লোকটি ওঠে না। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) পড়ে গেলেন বিপাকে, কী করা— মুখের ওপর বলেও দেয়া যাচ্ছে না যে, চলে যাও। তাই ইঙ্গিতে বললেন, 'একে তো অসুস্থতার জ্বালায় আছি, অপর দিকে যারা দেখতে আসে, তারাও কম কষ্ট দিচ্ছে না।' কিন্তু লোকটি তবুও যেন বুঝে না বরং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)কে উদ্দেশ্য করে বললো, 'হযরত! আপনার অনুমতি হলে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিতে পারি। তাহলে আর কেউ ঝামেলা করতে পারবে না।' আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, ভাই! বন্ধ করে দাও, তবে ভেতর থেকে নয়, বরং বের হয়ে বাইরে থেকে বন্ধ করে দাও।'

আসলে এ জাতীয় কিছু লোক থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এদের সঙ্গে এমন ব্যবহারই করতে হয়। তবে সাধারণ অবস্থায় যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যে, কেউ যেন একথা ভাবতে না পারে তাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা দয়া করে এসব সুন্নাতের ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"বড়দের সাক্ষাত পেলে, বিশেষ করে দ্বীনের দিক থেকে বড় এমন কোনো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দেখা হলে তাঁর কাছ থেকে উপদেশ প্রার্থনা করা উচিত। কারণ, অনেক সময় নসীহতের সাবলীল ধাক্কা শ্রোতার হৃদয়কে আলোকিত করে এবং এর মাধ্যমে তার হৃদয় নূর ও বরকতের প্রাচুর্যে ভরে ওঠে। ফলে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়।"

"মানুষের অন্তরে নেককাজ করার ইচ্ছা জাগলে শয়তান ভেতর থেকে হিসহিস করে ওঠে। সে ষড়যন্ত্রের টোপ এভাবে ফেলে যে, কাজটি অবশ্যই ভালো, তবে এখন করতে পার, পরেও করতে পার। মনে রাখবেন, এ ষড়যন্ত্রও খুবই সূক্ষ্ম। একেও তছনছ করে দিতে হবে।"

ছয়টি সোনালী উপদেশ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ - اَمَّا بَعْدُ!

عَنْ اَبِىْ جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ، لاَ يَقُوْلُ شَيْئًا اِلاَّ صَدَرُوْا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا : رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ - قَالَ لاَ تَقُلْ "عَلَيْكَ السَّلاَمُ" فَاِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ، قُلْ "اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ" قَالَ قُلْتُ، اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟ قَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِىْ اِذَا اَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَاِذَا اَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ اَنْبَتَهَا لَكَ، وَاِذَا كُنْتَ بِاَرْضٍ قَفْرٍ اَوْ فَلاَةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ - قَالَ قُلْتُ : اعْهَدْ اِلَىَّ قَالَ لاَ تَسُبَّنَّ اَحَدًا، قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا، وَلاَ عَبْدًا وَلاَ بَعِيْرًا وَلاَ شَاةً، وَلاَ تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَاَنْ تُكَلِّمَ اَخَاكَ وَاَنْتَ مُنْبَسِطٌ اِلَيْهِ وَجْهُكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ، وَارْفَعْ اِزَارَكَ اِلٰى نِصْفِ السَّاقِ، فَاِنْ اَبَيْتَ فَاِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَاِيَّاكَ وَاِسْبَالُ الْاِزَارِ، فَاِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ وَاِنْ امْرَأٌ شَتَمَكَ اَوْ عَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ فَاِنَّمَا وَبَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ

(ابو داود، كتاب اللباس - باب ما جاء فى اسبال الازار حديث ٤٠٨٤)

হামদ ও সালাতের পর!

বিশাল হাদীস। পুরোটাই আপনাদেরকে শোনালাম। মূলত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি হাদীসই অনবদ্য। প্রতিটি হাদীসের

শব্দশরীর যেমন সুন্দর, অনুরূপভাবে অর্থ-প্রাণও অনেক গভীর। এজন্য হাদীসের পঠন-পাঠনে রয়েছে বরকতের ছোঁয়া। হাদীসে রয়েছে এক অপার্থিব নূর এবং শুধুই নূর। যে নূর আপনাকে আলোকিত করে তুলবে মুহূর্তের মধ্যে। এ উপলব্ধি আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন। প্রতিটি হাদীসের ওপর আমল করার তাওফীকও তিনি আমাদেরকে দান করুন। আমীন।

প্রথম সাক্ষাত

সাহাবী হযরত জাবির ইবনে সুলাইম (রাযি.)। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা উক্ত হাদীসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তিনি। এর পূর্বে তিনি নবীজীকে জানতেন না, চিনতেন না। তাঁর ভাষায় তিনি বলেন–

'তাঁকে (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখলাম, প্রতিটি বিষয়ে মানুষ তাঁর কাছে ছুটে যাচ্ছে এবং পরামর্শ নিচ্ছে। তিনি যা বলে দেন, মানুষ তা বিনাবাক্যে গ্রহণ করে নিচ্ছে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে এই লোক?' তারা উত্তর দিলো, 'ইনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।' বুঝলাম, তাহলে ইনিই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি ধীরে ধীরে তাঁর কাছাকাছি পৌঁছলাম। عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ বলে একবার নয়; বরং দু'বার সালাম পেশ করলাম। তিনি আমার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং বললেন, 'শোনো! عَلَيْكَ السَّلَامُ নয়; বরং اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলো।' কারণ, عَلَيْكَ السَّلَامُ হলো মৃতদের জন্য। জীবিতদের জন্য এটি প্রযোজ্য নয়।' অর্থাৎ– মৃতদের প্রতি 'শান্তি' পাঠানোর পদ্ধতি হলো, প্রথমে سَلَامٌ শব্দ বলবে, তারপর عَلَيْكَ বলবে।

সালামের উত্তর যেভাবে দিবে

উক্ত হাদীসের মর্মার্থ এটাই। অর্থাৎ যে আগে সালাম দিবে, 'আস-সালামু আলাইকুম' সেই প্রথমে বলবে। আর উত্তরদাতা বলবে, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। আস-সালামু আলাইকুম-এর উত্তর হুবহু এভাবেই দিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে বটে, কিন্তু সুন্নাতের অনুকূলে হবে না। অথচ বর্তমানে 'সুন্নাত পরিপন্থী' পদ্ধতি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। বিষয়টি অবশ্যই শোধরাতে হবে।

সালামের উত্তর দু'জনই দিবে

পরস্পর সাক্ষাত লাভের পর যদি উভয়েই একই সাথে সালাম দিয়ে দেয়, তাহলে উত্তর দিতে হবে দু'জনকেই। কারণ, উত্তর দেয়া তখন উভয়ের জন্যই ওয়াজিব হয়ে যায়। সুতরাং وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ উভয়কেই বলতে হবে।

শব্দমালার তাৎপর্যও ইসলামে রয়েছে

মৌলিক আরেকটি বিষয় উক্ত হাদীস থেকে আমরা জানতে পেরেছি। বিষয়টি সম্পর্কে আমরা অনেকেই উদাসীন। তাহলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহ অর্থের দিক থেকে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাণসমৃদ্ধ, তেমন শব্দের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেখুন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবং وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ উভয় বাক্যের অর্থ অভিন্ন। অর্থাৎ– তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এরপরেও প্রথম সাক্ষাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবির (রাযি.)কে এ শিক্ষা দিলেন, মনগড়া পদ্ধতিতে সালাম দিলে হবে না। নিজের মতো করে চলার নাম ইসলাম নয়; বরং ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতলানো পদ্ধতিমতো চলার নাম। তাই ইসলামের সালাম পদ্ধতিতেও রয়েছে স্বতন্ত্র রীতি-পদ্ধতি। সেই পদ্ধতিতেই সালাম দাও। বলো, আস-সালামু আলাইকুম। তাহলে তোমার আমল সুন্নাতের অনুকূলে হবে।

বর্তমানে কিছু লোকের ধারণা হলো, 'শরীয়তের রূহই হলো মূখ্য বিষয়। শব্দমালার পেছনে কিংবা বাহ্যিক চমক-ঝলকের পেছনে পড়ার নাম শরীয়ত নয়।' আমি জানি না, 'রূহ' বলে এরা কী বুঝাতে চায়! কিংবা 'রূহ' তারা কী করেই বা দেখে!! কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্র তাদের এ কাজে আসে!!!

আসলে এরা অনুমাননির্ভর কথা বলে। সালামের কথাই ধরুন, কেউ যদি 'আস-সালামু আলাইকুম' না বলে তার অনুবাদ বলে দেয় যে, 'তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' তাহলে এটা কী সালাম হবে? সুতরাং বোঝা গেলো, রূহ এবং বাহ্যিক দিক– উভয়টাই ইসলামে কাম্য।

সালাম মুসলমানের প্রতীক

সালাম মুসলমানের প্রতীক। এর মাধ্যমে একজন মুসলমানকে সহজেই চেনা যায়। একবার আমি চীন সফর করেছিলাম। চীনে মুসলমান জনসংখ্যা যথেষ্ট রয়েছে। তবে তাদের ভাষা আর আমাদের ভাষা এক নয়। আমাদের ভাষা তারা বোঝে না, তাদের ভাষা আমরা বুঝি না। তাই পরস্পর কথাবার্তা ও

আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো। তবে একটি জিনিস হলো অভিন্ন। আমরা মুসলমান, তারাও মুসলমান। মুসলমান মুসলমানকে সালাম দেয়ার সুন্নাত তো সবখানেই আছে। অপরিচিত স্থানে এটাই হয়ে দাঁড়ায় হৃদ্যতা প্রকাশের একটা মাধ্যম।

চীন সফরেও আমার তাই হলো। এ ছিলো সুন্নাতের বরকত। একটি সুন্নাত বিশ্বের সব মুসলমানকে একই সুতোয় কীভাবে গেঁথে দিলো! এজন্য সালামের শব্দগুলোতে যে নূর ও বরকত রয়েছে, তা অন্য যে-কোনো ভাষাতে অনুপস্থিত।

এক সাহাবীর ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে একটি দু'আ শিখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রাতে ঘুমাবার পূর্বে এ দু'আটি পড়বে। দু'আটির শব্দগুলো ছিলো এই–

آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ

'আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন, তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আপনি যাকে পাঠিয়েছেন, সেই নবীর ওপর ঈমান এনেছি।'

কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সাহাবীকে ডাকলেন এবং পূর্বের শেখানো দু'আটি পড়তে বললেন। সাহাবী পড়লেন, তবে একটি মাত্র শব্দ তাঁর এদিক-সেদিক হয়ে গিয়েছিলো। সাহাবী যা পড়েছিলেন, তা ছিলো এই–

آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ

অর্থাৎ– 'নবী'র স্থলে তিনি 'রাসূল' পড়েছিলেন। অর্থের দিক থেকে উভয়টিই সমান, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন, 'যে শব্দমালায় দু'আটি আমি শিক্ষা দিয়েছি, হুবহু সেভাবেই বল।'

সুন্নাতের অনুসরণে যে প্রতিদান মিলে

ডা. আবদুল হাই (রহ.)– আল্লাহ তাঁকে সুউচ্চ মাকাম দান করুন– প্রায় বলতেন–

'তুমি একটি কাজ তোমার মর্জি মতে করলে। পরে সেই কাজটিই সুন্নাতের অনুসরণের নিয়তে করে দেখ, দেখবে– আসমান-যমীন সমান পার্থক্য তোমার অনুভূত হবে। যে কাজটি নিজের জন্য করলে– সেটা তোমার জন্যই হলো। এছাড়া অন্য কোনো প্রতিদান তুমি পাবে না। কিন্তু সেই কাজটিই সুন্নাতের

নিয়তে কর, তাহলে কাজটিও হবে, সাওয়াব পাবে। তখন সুন্নাতের নূর ও বরকত তোমাকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।'

হযরত আবু বকর (রাযি.), হযরত উমর এবং তাঁদের তাহাজ্জুদ

হাদীস শরীফে এসেছে, রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের খোঁজ-খবর নিতেন। একবার হযরত আবু বকর (রাযি.) এরও খোঁজ নিলেন। দেখতে পেলেন– তিনি তাহাজ্জুদ পড়ছেন এবং অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছেন। তারপর উমর (রাযি.)কে দেখার উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছেও গেলেন। দেখলেন, তিনিও তাহাজ্জুদে ডুবে আছেন এবং অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করছেন।

সকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কেই ডাকলেন এবং আবু বকর (রাযি.)কে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাতের বেলায় এ ক্ষীণ কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, যা আমি দেখেছি, বলুন তো, এর কারণ কী?' আবু বকর (রাযি.) উত্তর দিলেন, اَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ। যে সত্ত্বাকে আমার শুনানোর উদ্দেশ্য ছিলো, তাঁকে তো শুনিয়ে দিয়েছি। এজন্য তো উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াতের প্রয়োজন ছিলো না।'

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর (রাযি.)কে অনুরূপ প্রশ্ন করলেন, 'গত রাতে আপনাকে দেখেছি, তাহাজ্জুদ পড়ছিলেন আর কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন, বলুন তো, এত উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত কেন করলেন?' উমর (রাযি.) উত্তরে বললেন, اُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَاَطْرُدُ الشَّيْطَانَ 'যারা অলস ঘুমে কাতর, তাদেরকে জাগিয়ে দিচ্ছিলাম আর শয়তানকে তাড়া করছিলাম। তাই উঁচু গলায় তেলাওয়াত করলাম।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের উত্তর শুনলেন তারপর আবু বকর (রাযি.)কে বললেন, اِرْفَعْ قَلِيْلاً। 'আপনার কণ্ঠ আরেকটু দরাজ করবেন' এবং উমর (রাযি.)কে বললেন, اِخْفَضْ قَلِيْلاً। 'আপনার কণ্ঠ আরেকটু নিচু করবেন।'

আমল করবে আমার তরিকা মতো

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিলো, তাঁরা উভয়েই যেন কুরআনের এ আয়াতের ওপর আমল করেন–

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلًا

'নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কিংবা মৃদুস্বরে তেলাওয়াত করো না। উভয়ের মাঝামাঝি পন্থায় তেলাওয়াত কর।'

এ প্রসঙ্গে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) যা বলেছেন, তা আরও চমৎকার। তাঁর ভাষায়–

'উক্ত হেকমত যথাস্থানে সঠিক। তবে এর মাঝে গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি হেকমত রয়েছে। তাহলো, মূলত তিনি তাঁদের দু'জনকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, হে আবু বকর! হে উমর! এতদিন পর্যন্ত তোমাদের আমলটি ছিলো, তোমাদের নিজেদের মন মতো। আর ভবিষ্যতে আমলটি করে আমার মর্জিমতো। আমি যা বলেছি, সেটাই হবে তোমাদের পথ। এ পথ অবলম্বন করলে আমার সুন্নাতের অনুসরণ হবে। এর মাধ্যমে তোমরা সুন্নাতের নূর ও বরকত লাভে নিজেদেরকে আলোকিত করতে পারবে। সর্বোপরি সুন্নাত মতে চললে উত্তম প্রতিদান ও সাওয়াব পাবে।

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা কী শিক্ষা পেলাম? পেয়েছি একটি মৌলিক শিক্ষা। তাহলো সাধারণ কাজ কিংবা আমল আমরা তো এমনিতেই করি। প্রয়োজন শুধু সুন্নাতের নিয়ত করা। এক্ষেত্রে শব্দমালার প্রতিও লক্ষ্য রাখা। তাহলেই অর্জিত হবে সুন্নাতের নূর ও বরকত।

আমি সত্য, আমি আল্লাহর রাসূল

আলোচ্য হাদীসে জাবির ইবনে সুলাইম (রাযি.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সালাম দেয়ার পদ্ধতি যখন শিখিয়ে দিলেন, তখন আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি আল্লাহর রাসূল?'

তিনি উত্তর দিলেন–

'যখন তুমি বিপদগ্রস্ত হও, তখন যিনি তোমাকে উদ্ধার করেন, তোমার কষ্ট যিনি দূর করে দেন, যিনি তোমার ডাকে সাড়া দেন, আমি সেই আল্লাহর রাসূল। আমি সত্য আল্লাহর রাসূল।'

জাহিলি যুগে মানুষ মূর্তিপূজা করত। তাদেরকে খোদা হিসাবে জানতো। তবে তাদের মাঝে একটি গুণও ছিলো। তাহলো যখন কঠিন মুসিবতের জালে ফেঁসে যেতো, তখন আল্লাহকেই ডাকতো। কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে এসেছে–

وَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

যার মর্মার্থ হলো, 'মানুষ যখন নৌবিহারে বের হয়, তখন হঠাৎ তাদেরকে ঝড়ো হাওয়া আক্রমণ করে, বাঁচার কোনো উপায় তাদের সামনে থাকে না, সে সময় লাত, উয্যা, মানাতসহ অন্যান্য মূর্তির কথা তাদের স্মৃতিপটে আসে না, বরং তারা তখন আল্লাহ এবং শুধু আল্লাহকেই ডাকে যে, হে আল্লাহ! এ বিপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন।'

আলোচ্য হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি মিথ্যা খোদার রাসূল নই। আমি সত্য খোদার রাসূল। তারপর তিনি বলেছেন–

'আমি সেই আল্লাহর রাসূল, যিনি তোমাদের দুর্ভিক্ষ দূর করে দেন। দুর্দিনে আক্রান্ত হয়ে তাঁর কাছে মিনতি জানালে, তিনি সুদিন ফিরিয়ে দেন। যখন তুমি কোনো গনগনে রোদের ভেতর বিশাল মরুভূমি অতিক্রম কর, তখন তোমার উটটি যদি হারিয়ে যায়, আর সে কঠিন মুহূর্তে যে আল্লাহকে স্মরণ কর, হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ঝরিয়ে যে আল্লাহর কাছে আবেদন কর যে, হে আল্লাহ! আমার প্রিয় বাহনটি নেই, আমি নিরুপায়, একান্ত নিরুপায়, আমার উট, আমার প্রিয় বাহন আমাকে ফিরিয়ে দিন– তখন যে আল্লাহ তোমার উটটি পুনরায় তোমাকে দান করেন, আমি সেই আল্লাহর রাসূল।'

বড়দের কাছে উপদেশ চাওয়া

তারপর জাবির ইবনে সুলাইম (রাযি.) বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু নসীহত করুন।' এখান থেকে বুযুর্গানে দ্বীন মূলনীতি বের করেছেন যে, বড়দের সাক্ষাত পেলে, বিশেষ করে দ্বীনের দিক থেকে বড় এমন কোনো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দেখা হলে, তখন তাঁর কাছ থেকে উপদেশ প্রার্থনা করা উচিত। কারণ, অনেক সময় নসীহতের ভাষা শ্রোতার হৃদয়কে আলোড়িত করে দেয়। এর মাধ্যমে তার হৃদয় নূর ও বরকতের প্রাচুর্যে ভরে ওঠে। তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। ইখলাস ও মহব্বতের সঙ্গে নসীহত কামনা করলে সেখানে আল্লাহর রহমতও থাকে। তখন বড়'র মুখ থেকে আল্লাহ এমন কথা বের করে দেন, যেই কথা হৃদয়েরই ভাষা।

প্রথম নসীহত

তাই এ হাদীসে আমরা দেখতে পাই, জাবির (রাযি.) নসীহত কামনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। তিনি নসীহত করলেন–

لَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا

'কাউকে গালি দিবে না। কাউকে কটু কথা বলবে না।'

দেখুন, এ ছিলো জাবির (রাযি.)-এর প্রথম সাক্ষাত। এর পূর্বে তিনি নবীজীকে দেখেননি। প্রথম সাক্ষাতেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসীহত ছিলো, 'অন্যকে গালি দিবে না, কটু কথা বলবে না, কারও সঙ্গে অসদাচরণ করবে না।' প্রথম সাক্ষাতে এবং প্রথম নসীহতে তিনি একজন মানুষের মনের প্রতি এতটা লক্ষ্য রেখেছেন। তাই একজন মুসলমানের উচিত, অপর ভাইয়ের অন্তরে আঘাত না দেওয়া।

আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর ঘটনা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রধান সাহাবী। তাঁর একজন গোলাম ছিলো, যাকে তিনি কোনো কারণে লানত করেছিলেন। মূলত গোস্বার ধাক্কা সামলাতে না পেরে তাঁর মুখে 'লানত' শব্দটি বের হয়ে গিয়েছিলো। বিষয়টি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনলেন, তিনি তাঁর এ প্রিয় সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন–

لَعَّانِيْنَ وَصِدِّيقِيْنَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

'লানত করবে, সিদ্দীকও হবে। কাবার প্রভুর কসম! এ দু'টি এক সঙ্গে থাকতে পারে না।'

এত কঠোর ভাষা তিনি তাঁর সবচে' প্রিয় সাহাবীকে বলেছেন, শুধু একজন গোলামের মনের প্রতি তাকিয়ে। এরপর কী হলো? হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) গোলামটিকে আযাদ করে দিয়েছিলেন।

উপদেশটি আমি আজীবন মেনে চলেছি

অথচ আমাদের বর্তমান কর্মপন্থা চলছে শরীয়তবিরোধী স্রোতের দিকে। অপর ভাইকে গালি দেয়া, কটু কথা বলা, খবিছ-আহম্মক, কমবখত ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা মুসলিম সমাজেও আজ সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। লক্ষ্য করুন, জাবির (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত উপদেশ পেয়ে কী বলছেন। তিনি বলেন–

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নসীহত আমি আজীবন মেনে চলেছি। এরপর থেকে কোনো গোলামকে, না কোনো স্বাধীন লোককে, না কোন উটকে এমনকি বকরিকেও নয়– আমি আর কখনও মন্দ কথা বলিনি।'

সাহাবাদের কর্মপন্থা ছিলো এমনই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা তাঁরা পালন করেছেন অক্ষরে অক্ষরে। গোটা জীবনকে সমৃদ্ধ করে নিয়েছেন তাঁরই দিক-নির্দেশনা মাফিক।

পাপকে ঘৃণা করো– পাপীকে নয়

উক্ত নসীহতের আরেকটি দিকও রয়েছে। তাহলো কাউকে মন্দ বলো না– এর অর্থ হলো, লোকটি যত মন্দই হোক না কেন, যত নাফরমানিই সে করুক না কেন, তোমরা তাকে মন্দ বলো না। তাকে হীন কিংবা ঘৃণিত ভেবো না। পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়। কারণ, ওই ব্যক্তির শেষ পরিণাম কী হবে, সেটা তোমার জানা নেই। জানা নেই, আজকে পাপিষ্ঠই আগামীতে নেক আমলের আলোতে ঝকমক করে ওঠবে কিনা। এমনও তো হতে পারে, আল্লাহ তাকে শুদ্ধ করে দিবেন, মৃত্যুর পূর্বে তার তাওবা নসীব হবে এবং নেক আমলের তাওফীকও হয়ে যাবে।

এমনটি কাফেরকেও মন্দ বলা যাবে না। কারণ, হতে পারে তার ঈমান নসীব হবে, তারপর তোমার থেকেও বেশি ঈমানের আলো পাবে। হাদীস শরীফে এসেছে– اَلْعِبْرَةُ بِالْخَوَاتِيْمِ অর্থাৎ 'দেখার বিষয় হলো পরিণাম ফল। কে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে– সেটাই দেখার বিষয়।' ঈমান নিয়ে মরতে পারলে, নেক আমল নিয়ে বিদায় নিতে পারলে আল্লাহর দরবারে সে প্রিয়। তাহলে ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণে হতে পারে, সেও তোমার চেয়ে অগ্রগামী।

এক রাখালের বিস্ময়কর ঘটনা

খায়বারের যুদ্ধের সময়কার ঘটনা। এক রাখাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এলো। সে ইয়াহুদীদের বকরি চরাতো। খায়বারের প্রান্তরে মুসলমানদের তাঁবু তার নজরে পড়লে সে ভাবলো, আমি তাদের কাছে যাবো এবং দেখবো তারা কী বলে, কী করে।

ভাবনা মতো সে বকরি চরাতে চরাতে একদিন পৌঁছে গেলো শত্রুশিবিরে। মুসলমানদের কাছে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের নেতা কোথায়?' সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবুটি দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে আমাদের নেতার তাঁবু। তিনি সেখানেই আছেন।' রাখাল হতবাক হয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবুর প্রতি তাকালো। তার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না যে, এত বড় নেতা, এত বড় বাদশাহ, তার তাঁবু কী করে এত সাদামাঠা হয়! খেজুর পাতার তাঁবু একজন সম্রাটের জন্য কি মানায়! বিস্ময়ের ঘোর যেন তার কাটে না। অবশেষে সে আস্তে আস্তে ওই তাঁবুতে প্রবেশ করলো, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করলো, আপনি কী পয়গাম নিয়ে এসেছেন? কিসের দাওয়াত দিচ্ছেন?'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ঈমান ও ইসলামের কথা তার সামনে তুলে ধরলেন এবং তাঁকেও ইসলামের ওপর ঈমান

আনার আহ্বান জানালেন। সে বললো, 'ইসলাম গ্রহণ করলে আমি কী পাবো? আমি কোন মর্যাদার অধিকারী হবো?' নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, 'যদি তুমি ইসলামে প্রবেশ কর, তাহলে তুমি হবে আমাদের ভাই। আর আমি তোমাকে আলিঙ্গন করবো।' এর উত্তর শুনে সে আরেকবার বিস্মিত হলো, বললো, 'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? কোথায় আমি আর কোথায় আপনি! আমি তো একজন নগন্য রাখাল মান। গায়ের রংটাও আমার কালো। শরীরটা দুর্গন্ধে ভরা। এ অবস্থাতেও আপনি আমার সঙ্গে কোলাকুলি করবেন?'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন—

'আমি অবশ্যই তোমাকে বুকে টেনে নিবো। তোমার কালো শরীরকে আল্লাহ আলোকিত করে দিবেন। শরীরের দুর্গন্ধও সুগন্ধি দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন।'

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব কথা তার হৃদয়কে নাড়া দিয়ে দিলো। সে মুসলমান হয়ে গেলো। তারপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমি কী করবো?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার ইসলাম গ্রহণের মুহূর্তটি এমন যে, এখনও নামাযের সময় হয়নি। এটা রমযানের মাসও নয় কিংবা যাকাত দেয়ার সময়ও এখন নয়। সুতরাং আপাতত এগুলো তোমার জন্য ফরয নয়। এখন শুধু একটা কাজ আছে। কাজটি একটু কঠিন। কারণ, কাজটি করতে হবে, তরবারীর ছায়াতলে থেকে। যাকে বলা হয়, জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ। তথা আল্লাহর পথে জিহাদ করা। এটাই তোমার বর্তমান কাজ।'

রাখাল উত্তর দিলো, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যাচ্ছি। এ জিহাদে অংশ নিতে যাচ্ছি। কিন্তু আমার একটা কথা আছে, যে ব্যক্তি জিহাদ করে, সে শহীদ কিংবা গাজী হয়। আমি যদি শহীদ হই, তাহলে আপনি আমার যিম্মাদার হবেন কি?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আমি যিম্মাদার হলাম। জিহাদে শহীদ হলে জান্নাতের নিশ্চয়তা তোমাকে দিলাম। আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে জান্নাত দান করবেন। আর তখনি তোমার দুর্গন্ধময় শরীর থেকে সুগন্ধি ছড়াবে। তোমার কালো চেহারা সফেদ হয়ে যাবে।'

বকরীগুলো দিয়ে এসো

সে তো ছিলো ইয়াহুদীদের রাখাল, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'ইয়াহুদীদের যে বকরীগুলো নিয়ে তুমি এসেছো, যাও, সেগুলো তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে এসো। কারণ, বকরীগুলো তোমার কাছে আমানত হিসেবে আছে।'

একেই বলে মহান চরিত্র। ইয়াহুদীদের সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধ হতে যাচ্ছিলো। কিন্তু যাদেরকে তিনি অবরোধ করে রেখেছেন, যাদের সম্পদগুলো গনীমতের সম্পদ হতে যাচ্ছে, সেই শত্রুদের সম্পদ তিনি শত্রুদের কাছেই দিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। রাখালও সেই নির্দেশ পালন করলো। তারপর ফিরে এসে জিহাদে অংশ নিলো এবং শহীদ হয়ে গেলো।

জান্নাতুল ফেরদাউস তার ঠিকানা

এক পর্যায়ে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের খোঁজ-খবরে লেগে গেলেন। এক জায়গায় সাহাবায়ে কেরামের ভিড় দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন এবং ভিড়ের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবায়ে কেরাম জানালেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাদের মধ্যে এমন একজন লোককে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যাকে কেউই চেনে না।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'কই, দেখি তো, কে সে?' এরপর যখন দেখলেন, বললেন–

'এ তোমাদের কাছে পরিচিত নয়। একে আমি চিনি। সে একজন রাখাল। আল্লাহর এক চমৎকার ও বিস্ময়কর বান্দা। এমন এক বান্দা, যে একটি সিজদাও করেনি। আর তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেছে। অনায়াসে সে জান্নাতে চলে যাচ্ছে। আমি স্বচক্ষে এও দেখেছি যে, ফেরেশতারা তাকে গোসল দিচ্ছে। সে একজন কালো মানুষ, অথচ কত সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। তার শরীর থেকে দারুণ সুগন্ধিও ছড়াচ্ছে।'

শেষ পরিণামই হলো আসল

দেখুন! সময়ের ব্যবধান কতটুকু? কতটুকু সময়ের ভেতরে উক্ত রাখালের সৌভাগ্যের দ্বার খুলে গেলো। অথচ এর একটু পূর্বেও যদি তার মৃত্যু হতো, তাহলে ঠিকানা জাহান্নাম ছাড়া আর কোথায় হতো! মাত্র কয়েক মুহূর্তের ভেতরে একজন জাহান্নামী পরিণত হলো জান্নাতীতে। اَلْعِبْرَةُ بِالْخَوَاتِيْمِ 'শেষ অবস্থাই হলো, আসল অবস্থা', হাদীসের মধ্যে এজন্যই বলা হয়েছিলো।

সুতরাং গর্ব কিংবা অহংকার, বড়াই কিংবা আত্মপ্রসাদ একজন মানুষের জীবনে কাম্য নয় কখনও।

কুকুর শ্রেষ্ঠ, না তুমি শ্রেষ্ঠ?

ঘটনাটি আব্বাজান থেকে শুনেছি। এক বুযুর্গের ঘটনা। এক লোক তাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিলো। যেমনটি আজকাল মানুষ করে থাকে, সাদাসিধা মানুষ দেখলে বলে থাকে। এ লোকটিও তা-ই করলো। ঠাট্টা করে বুযুর্গকে বললো, 'বলো তো তুমি শ্রেষ্ঠ, না আমার এ কুকুরটি শ্রেষ্ঠ?'

এ প্রশ্নে বুযুর্গ রাগ করলেন না। চেহারায় একটুও পরিবর্তন এলো না। বরং তিনি বললেন, 'এ মুহূর্তে আমি কিছুই বলতে পারছি না। আমি শ্রেষ্ঠ না এ কুকুরটা শ্রেষ্ঠ– এ প্রশ্নের উত্তর আপাতত আমার কাছে নেই। কারণ, জানা নেই, আমি কীভাবে মারা যাবো...। যদি ঈমান নিয়ে মরতে পারি, তাহলে আমি কুকুরটার চেয়েও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আর যদি ঈমান নিয়ে মরতে না পারি তবে... এ কুকুরটা আমার চেয়ে উত্তম। যেহেতু কুকুরের জাহান্নাম নেই, তাই তার ভয়ও নেই। আর আমার তো তখন জাহান্নাম ছাড়া কোনোই উপায় থাকবে না।'

প্রকৃত আল্লাহর বান্দা এদেরকেই বলে। এইজন্যই বলা হয়েছে, পাপীকে নয়– পাপকে ঘৃণা কর।

হযরত থানবী (রহ.)-এর বিনয়

হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলতেন, 'আমার অবস্থা হলো, আমি প্রত্যেক মুসলমানকে ফিলহাল আমার চেয়ে ভালো জানি, আর প্রত্যেক কাফেরকে ভবিষ্যতকাল হিসাবে উত্তম জানি। মুসলমান সে তো মুসলমান, তার হৃদয়ে আছে ঈমান, তাই সে আমার চেয়ে উত্তম। আর কাফের হতে পারে, সে ভবিষ্যতের ঈমানদার, আল্লাহর তাওফীক সাথী হলে ঈমান তার নসীব হবে, তাই সে সম্ভাবনার ওপর ভর করে বলতে পারি, সে আমার চেয়ে উত্তম, আমি তার চেয়ে অধম।'

থানবী (রহ.)-এর মুখে যদি এমন কথা বের হয়, চিন্তা করুন, আমার আর আপনার অবস্থান তাহলে কোথায়...।

তিন বুযুর্গের ঘটনা

হযরত থানবী (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা মুফতী মুহাম্মদ হাসান (রহ.) একবার বললেন, আমরা যখন থানবী (রহ.)-এর মজলিসে বসি, আমার কাছে মনে হয়, মজলিসের সকল লোক আমার চেয়ে ভালো। আর আমি সকলের চেয়ে ছোট। মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ সাহেব (রহ.)– তিনি থানবী (রহ.) একজন বিশিষ্ট খলীফা। একথা শুনে বললেন, আমার অবস্থাও তো একই। চলুন, উভয়ে আমরা থানবী (রহ.)-এর দরবারে যাই। আমাদের এ অবস্থা! জানা নেই, বুযুর্গদের দরবারে এর কী ব্যবস্থা আছে... কাজেই হযরত থানবীকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন।

তাই উভয়ে থানবী (রহ.)-এর দরবারে গেলেন এবং বললেন, হযরত! আমরা যখন আপনার দরবারে বসি, তখন আমাদের দিলে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। থানবী (রহ.) উত্তর দিলেন, তোমাদের অবস্থা তো তোমরা বলেছো, এবার আমার অবস্থাটাও একটু শোনো, সত্য কথা হলো– আমারও একই অবস্থা। আমার কাছেও মনে হয়, উপস্থিত মজলিসে সবচেয়ে নগণ্য আমিই।'

ঘটনাটি আমি হযরত মুফতী হাসান (রহ.)-এর খলীফা ডা. হাফিযুল্লাহ (দা. বা.)-এর মুখে শুনেছি।

নিজের ত্রুটি দেখো

যে লোক নিজের দোষ নিজে দেখে এবং আল্লাহর ভয় ও মহব্বত যার অন্তরে আছে, সে অপরের দোষ দেখার সুযোগ কোথায়? যে নিজের পেটের ব্যথায় কাতর, সে অপরের হাঁচির দিকে নজর দেয়ার অবকাশ কোথায়? অনুরূপভাবে যায় অন্তর আল্লাহর ভয়ে কম্পমান, অপর ভাইকে অবজ্ঞা করার সুযোগ তার নেই। সে নিজের ফিকির করবে, না অপরের প্রতি নজর দিবে?

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের গীবত

এগুলো দ্বীনেরই কথা। যদিও আমরা ভুলে বসে আছি। ইবাদত, নামায, তাসবীহ ইত্যাদি আমাদের কাছে 'দ্বীন' বলে মনে হয়, অথচ দ্বীনের আরো বহু বিষয় রয়েছে, যেগুলো আমরা জানি না। মুখে যা আসে তাই বলে দেয়া, এর মাধ্যমে যে গুনাহ হয়ে যাচ্ছে– সেটার প্রতি আমরা লক্ষ্য করি না। অথচ প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি বস্তু, ছোট হোক কিংবা বড় আল্লাহর দরবারে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। আল্লাহ বলেছেন–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

অর্থাৎ– প্রতিটি কথা রেকর্ড কথার জন্য রয়েছে একজন সুদক্ষ পর্যবেক্ষক। উচ্চারণ করা মাত্রই তা রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে।

একবার বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)-এর মজলিসে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সম্পর্কে এক ব্যক্তি বিরূপ মন্তব্য করলো। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পরিচয় আমরা সকলেই জানি। যার যুলুম ও জিঘাংসার গল্প রূপকথার মতো ছড়িয়ে আছে। হাজার হাজার মুসলমানকে যে বিনা কারণে হত্যা করেছে– সেই হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ। তার সম্পর্কে গীবত করা হচ্ছে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)-এর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমালোচকের মুখ বন্ধ করে দিলেন। বললেন–

'দেখো, তুমি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের গীবত করে একথা মনে করো না, সে হাজার হাজার মুসলমানের রক্ত ঝরিয়েছে, তাই তার গীবত হালাল হয়ে গিয়েছে। যে দিন হিসাবের সময় হবে, সে দিন আল্লাহ তাআলা যেমনিভাবে হাজার হাজার মুসলমানের রক্তের হিসাবের হাজ্জাজ থেকে নিবেন, তেমনিভাবে হাজ্জাজের গীবতের হিসাবও তোমার থেকেও নিবেন।'

সুতরাং অযথা গীবতের মাঝে মত্ত হয়ে যেও না। তবে যদি অপর ভাইকে অনিষ্টতা থেকে বাঁচানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। তখন এভাবে বলা যেতে পারে যে, ভাই! অমুক লোক থেকে একটু সতর্ক থেকো।

আম্বিয়ায়ে কেরামের চরিত্র

গালির পরিবর্তে গালি দেয়ার অভ্যাস নবীদের জীবনে ছিলো না। অথচ শরীয়তে এর অনুমতি নেই এমনও নয়। শরীয়তে এতটুকু অনুমতি আছে যে, যে যতটুকু যুলুম করবে, তার থেকে ততটুকু প্রতিশোধ নিবে। নবীগণ এতটুকুও করেননি বরং তারা আরো উন্নত চরিত্রের নজীর দেখিয়েছেন। জাতির পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি গালির স্রোত এসেছে। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে–

إِنَّا لَنَرَاكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ

তাদের জাতি এ পর্যন্ত বলেছিলো, 'তুমি অথর্ব। তুমি নির্বুদ্ধিতার মাঝে ডুবে আছো। আমরা তো মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদী।'

এত বড় কথার পরেও ধৈর্য ও চরিত্রের সর্বোত্তম নমুনা দেখিয়েছেন। আমাদেরকে কেউ এত বড় কথা বললে তো আমরা রাগে ফেটে পড়তাম। আরো কত কী করতাম। অথচ তাঁদের জবাব ছিলো কত কোমল, কত স্নিগ্ধ। উত্তরে তারা শুধু বলতেন–

'হে আমার জাতি, আমি নির্বোধ নই। আমাকে প্রভুর পক্ষ থেকে রাসূল হিসাবে পাঠানো হয়েছে।'

হযরত শাহ ইসমাঈল (রহ.)-এর ঘটনা

শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) ছিলেন শাহী খান্দানের মানুষ। আল্লাহ তাঁর হৃদয়ে দ্বীনের জযবা দান করেছিলেন। মানুষের কাছে দ্বীন পৌছানোর দরদমাখা গরজ আল্লাহ তাঁর অন্তরে ঢেলে দিয়েছিলেন। শিরক-বিদআতের বিরুদ্ধে তিনি অগ্নি ঝরাতেন।

এক দিনের ঘটনা। তিনি দিল্লীর জামে মসজিদে ওয়াজ করছিলেন। হঠাৎ এক দুষ্টলোক তখন দাঁড়িয়ে গেলো। উদ্দেশ্য ছিলো, শাহ সাহেবকে অপমানিত করা। সে সকলের সামনে বলে বসলো, 'মাওলানা! আমরা শুনেছি, আপনি নাকি জারজ সন্তান।'

তাকওয়ার উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিশ্বখ্যাত আলেম ও শাহী খান্দানের লোক হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.)। তাঁকে লক্ষ্য করে এমন জঘন্য মন্তব্য– বলুন তো, আমাদের কেউ কি তা সহ্য করতো? আমরা তো এমন মন্তব্যে একেবারে ফেটে পড়তাম, পারলে ওই লোকের মাথা গুঁড়ো করে দিতাম। কিন্তু নবীদের প্রকৃত উত্তরসূরী ছিলেন তিনি, তাই বিস্ময়কর খোশ মেজাজেই তিনি উত্তর দিলেন,

'আপনি যা শুনেছেন, তা ভুল। আমার আম্মাজানের বিবাহের সাক্ষ্য যারা দিয়েছেন, তাঁরা এখনও এই দিল্লীতেই আছেন।'

নবীদের চরিত্রে নিজেকে সমৃদ্ধ করার উত্তম নমুনা তো এরাই। গালির পরিবর্তে গালি না দিয়ে কত আলতোভাবে তাকে নিজের কথাটা বলে দিলেন।

দ্বিতীয় নসীহত

আলোচ্য হাদীসে তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় নসীহত পেশ করেছেন যে, 'যে কোনো নেক কাজকে ছোট মনে করো না, যখন যে নেক কাজ করার সুযোগ ও তাওফীক হবে, তাকে গনীমত মনে করে আমল করবে।'

শয়তানের ষড়যন্ত্র

মূলত নসীহতটির মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের এক গোপন ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়েছেন। শয়তানের একটা ষড়যন্ত্র হলো, কারো মনে কোনো নেক কাজের ধারণা এলে সে এই বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, 'আজীবন তো তোমার বিপথেই কেটেছে। গুনাহ এবং গুনাহ তোমার জীবনে থৈ থৈ করছে। এখন এই একটি নেক কাজ, তাও আবার বড় নয়। বরং ছোট– এত ক্ষুদ্র নেক কাজটি করে এমন কোন জিনিস তুমি উল্টিয়ে ফেলবে, কোন ধরনের জান্নাত তুমি পেয়ে যাবে...। সুতরাং রাখ তোমার নেক কাজ। খাও, দাও, ফূর্তি কর এবং নেক কাজটি ছেড়ে দাও।' এভাবে কুমন্ত্রণার জোরালো ধাক্কায় নেক কাজের বাসনা টলায়মান হয়ে ওঠে এবং শয়তান সফল হয়ে যাবে।

এটা মূলত একটি গভীর ষড়যন্ত্র। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের এ ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কোনো নেক কাজকে ছোট মনে করে ছেড়ে দিয়ে না। বরং সুযোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে করে নাও।

ছোট আমলও নাজাতের কারণ হতে পারে

এছাড়া আরো অনেক হেকমত উক্ত নসীহতে রয়েছে। প্রথমটি তো হলো, নেক কাজ যত ছোট হোক, ছোট মনে করতে নেই। কেননা, হতে পারে আমাদের দৃষ্টিতে যেটি ছোট, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা বড়। আল্লাহর দরবারে এ একটি মাত্র আমল কবুল হয়ে গেলে, নাজাতের সম্ভাবনাও খুলে যাবে। বিভিন্ন হাদীসে এবং বুযুর্গানে দ্বীনের ঘটনাবলীতে এর নজীর আমরা দেখতে পাই।

এক ব্যভিচারিনীর গল্প

গল্পটি বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে। এক ব্যভিচারী নারী কোথাও যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে দেখতে পেলো একটি কুকুর কূপের পাড়ে পড়ে আছে, প্রবল

পিপাসায় তার জিহ্বা বের হয়ে গিয়েছে, হাঁপাচ্ছে। কিন্তু পানি একটু গভীরে, চেষ্টা করেও সে পান করতে পারছে না। এ অবস্থা মহিলাটির অন্তরে দয়া জেগে ওঠলো, সে ভাবলো, আহা! এ কুকুরটিও তো আল্লাহর সৃষ্ট, তেষ্টায় সে মারা যাচ্ছে, আল্লাহর এ সৃষ্টি কতই না কষ্ট পাচ্ছে। মহিলাটি বালতি খোঁজ করলো, পেলো না। অন্য কোনো উপায়ে পানি নেয়ার চেষ্টা করলো, তাও পারলো না। অবশেষে নিজের পা থেকে চামড়ার মোজাটি খুলে ফেললো এবং কোনোভাবে তা পানি দ্বারা ভর্তি করে কুকুরটিকে পান করালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মহিলার এ আমল আল্লাহর কাছে এত পসন্দনীয় হলো যে, এর কারণে সে মাফ পেয়ে গেছে।

দেখুন, মহিলাটি যদি এর বিপরীত কাজ করতো, যদি সে ভাবতো, আমার জীবনটা তো পাপপূর্ণ, পাপের সাগরে এ সামান্য আমল কী উপকারে আসবে, তাহলে সে মুক্তির চিন্তাও করতে পারতো না।

মাগফিরাতের আশায় গুনাহ করো না

উক্ত ঘটনা থেকে কিন্তু গলদ ফায়দা উঠানো যাবে না। একথা মনে করে যাবে না যে, যত পার গুনাহ কর, তারপর একদিন একটি কুকুরকে ধর এবং তার পিপাসা মিটাও, এতেই কেল্লা ফতেহ হয়ে যাবে....– এ জাতীয় ভাবনা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, এখানে দু'টি বিষয় আছে। এক. আল্লাহর কানুন। দুই. আল্লাহর রহমত। আল্লাহর কানুন হলো, গুনাহগার গুনাহ পরিমাণে শাস্তি পাবে। আর আল্লাহর রহমত হলো, কাউকে হয়ত তার বিশেষ কোনো আমলের কারণে মাফ করে দিবেন। দেখার বিষয় হলো, রহমত কে পাবে, কখন পাবে, কোন আমলের ভিত্তিতে পাবে– এসব কিছু কেউই জানে না। অতএব, এ ধরনের অহেতুক বাসনা করা যে, কোনো না কোনো আমল আল্লাহ কবুল করেন এবং মাফ করে দিবেন, বিধায় গুনাহ করলেই বা কী– এমন চিন্তা করা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ (ترمذى، باب صفة القيامة، رقم الحديث ٢٤٦١)

'যে নিজের খাহেশের পেছনে ছুটে বেড়ায়, কামনার স্রোতে ভেসে বেড়ায় এবং এই আশা করে যে, আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন, সেই ব্যক্তি অক্ষম।'

বর্তমানের চিত্র হলো, যদি বলা হয়– 'গুনাহগুলো ছেড়ে দাও।' উত্তর দেয়, 'আল্লাহ বড় দয়ালু, ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করে দিবেন। একেই বলে অহেতুক আশা করা। এর উদাহরণ হলো এমন যে, এক ব্যক্তি পূর্ব দিকে দৌড়াচ্ছে, আর

আশা করছে, আল্লাহ আমাকে পশ্চিমে নিয়ে যাবেন। অনুরূপভাবে পথ অবলম্বন করছে জাহান্নামের অথচ আল্লাহর কাছে আশা করছে জান্নাতের। হ্যাঁ, আল্লাহর বিশেষ রহমতে কেউ হতে পার পেতে পারে। কিন্তু রহমত তো রহমতই। রহমত কখনও কানুন হয় না। কানুন হলো, তিনি গুনাহর শাস্তি দিবেন।

এক বুযুর্গ ক্ষমা লাভ করলেন যেভাবে

আমার শায়েখ ডা. আবদুল হাই (রহ.)-এর কাছে আমি ঘটনাটি শুনেছি। এক বুযুর্গ, যিনি ছিলেন একজন বড় মাপের মুহাদ্দিস। হাদীসের খেদমতে গোটা জীবন যিনি কাটিয়েছিলেন। যখন তাঁর ইন্তেকাল হলো, কোনো ব্যক্তি তাঁকে স্বপ্নে দেখলো এবং জিজ্ঞেস করলো, 'হযরত! আল্লাহর আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছেন?'

বুযুর্গ উত্তর দিলেন, 'সে এক অবাক কাণ্ড। আমি গোটা জীবনটা ইলম ও হাদীসের খেদমতে কাটালাম। দরস-তাদরীস, ওয়াজ-নসীহত ও লেখালেখি– এই তো ছিলো আমার পুরা জীবনের কাজ। আমার ধারণা ছিলো, এসব আমলের প্রতিদান আমি পাবো। কিন্তু আল্লাহ কী করলেন জানো? তিনি আমার এতসব আমলের কথা কিছু বললেন না বরং বললেন, তোমার একটি আমল আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। তাহলো একদিন তুমি হাদীস লেখায় মগ্ন ছিলে, তখন তুমি দোয়াতের ভেতর কলম ডুবিয়ে কালি নিয়েছিলে, আর সেই সময় একটি পিপাসার্ত মাছি এসে তোমার কলমের নিভে বসলো এবং কালি শুষে তার পিপাসা নিবারণ করলো। সে দিন তুমি মাছিটির ওপর সমবেদনা দেখিয়েছিলে। তুমি ভেবেছিলে, এ তো আল্লাহর মাখলুক। পিপাসার্ত সে। কালি শুষে তার পিপাসা নিবারণ করছে। করুক, তার পিপাসা নিবারণ হোক, তারপর আমি লিখবো। এ ভেবে তুমি কিছুক্ষণের জন্য কলম চালানো বন্ধ রেখেছিলে। তারপর মাছিটি যখন চলে গেলো, তখনই লেখা শুরু করেছিলে। এই যে আমলটি তুমি করেছিলে, তা আমাকে খুশি করার জন্যই করেছিলে। এইজন্যই আমি তোমার সেই আমলটির প্রতিদান হিসাবে তোমাকে মাফ করে দিলাম।

দেখুন! একদিকে আমরা ভেবে রেখেছি, ওয়াজ করা, ফতোয়া দেয়া, তাহাজ্জুদ পড়া, লেখালেখি করা প্রভৃতি আমল অনেক বড় আমল। আর অপর দিকে এসব বড় আমলের কথা আল্লাহ তাআলা উল্লেখই করলেন না! অথচ উক্ত বুযুর্গ কলমকে ক্ষণিকের জন্য যদি না থামাতেন, তাহলে হয়ত হাদীসের একটি শব্দ হলেও লেখা হতো। কিন্তু আল্লাহর একটি ছোট্ট মাখলুকের প্রতি একটু মমতা দেখানোর ফযীলত এখানে এর চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিলো। যদি তিনি 'সাধারণ' মনে করে আমলটি ছেড়ে দিতেন, তবে এত বড় ফযীলত থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতেন।

আসলে আল্লাহর দরবারে কোন আমলটি কখন কবুল হয়ে যায়, তা বলা মুশকিল। মূলত তাঁর দরবারে আমলের উপচানো ভিড় কিংবা বিশাল সাইজের

কোনো মূল্য নেই। বরং মূল্য হলো, আমলের ওযনের। আর ওযন তৈরি হয় ইখলাসের মাধ্যমে। আমল হয়ত সাইজে বড়, গণনায়ও অনেক, তবে ইখলাসশূন্য, তাহলে সেই আমলের কোনোই মূল্য নেই। অপর দিকে ছোট্ট একটি আমল, তবে ইখলাসসমৃদ্ধ আমল, তাহলে এরই তখন আল্লাহর দরবারে বড় হয়ে যায়। এইজন্যই ছোট-বড় সব আমলেই ইখলাস থাকতে হবে। অন্যথায় সেই আমল বিফলে চলে যাবে।

নেককাজ নেককাজকে আকর্ষণ করে

আলোচ্য হাদীসের দ্বিতীয় নসীহতে দ্বিতীয় হেকমত হলো, নেক কাজ করার ইচ্ছা সৃষ্টি হওয়ার পর তা করে নিলে, আরেকটি নেক কাজ করারও তাওফীক হয়ে যাবে। কারণ, নেককাজ নেককাজকে টানে এবং মন্দ মন্দকে টানে। অনেক সময় একটি মাত্র গুনাহ আরো শত গুনাহর জন্ম দেয়। অপর দিকে অনেক সময় একটি ছোট্ট আমলের বরকতেও জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি হতে পারে। অন্ধকারময় জীবন আলোকিত জীবনে পরিণত হতে পারে।

নেককাজের ইচ্ছা আল্লাহর মেহমান

আমার শায়েখ হযরত মাসীহুল্লাহ খান (রহ.) বলতেন, 'নেক কাজের বাসনা অন্তরে জেগে ওঠা, সুফীদের ভাষায় এর নাম– ওয়ারিদ। ওয়ারিদ আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। সে আল্লাহর মেহমান। তুমি যদি এ মেহমানের কদর কর তথা যদি নেক কাজটি করে নাও, তাহলে সে আবারও আসবে। আজ একটি নেককাজ তোমার অন্তরে এলো, তুমি আমলও করলে– এর অর্থ হলো, তুমি মেহমানের খাতির করলে। এ খাতির যত বাড়বে, তোমার নেক আমলও তত বাড়বে। কিন্তু যদি তাকে তাড়িয়ে দাও অর্থাৎ যে নেক কাজটি করার ইচ্ছা তোমার হয়েছিলো, দুর্ব্যবহার করলে, বিধায় সে আর আসতে চাইবে না। তারপর এক সময় এমন আসবে যে, সে সম্পূর্ণভাবে তোমাকে বয়কট করবে। নেক কাজের ইচ্ছাটাও তোমার থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।' কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ– বদ আমলের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা ধরেছে। এখন নেক কাজের ইচ্ছাটাও তাদের থেকে চলে গেছে।

শয়তানের দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র

তৃতীয় হেকমত হলো, মানুষের অন্তরে নেককাজ করার ইচ্ছা জাগলে শয়তান তার ভেতর থেকে হিসহিস করে ওঠে। সে ষড়যন্ত্রের টোপ এভাবে ফেলে যে, 'দেখো, কাজটি এখন করতে পার, পরেও করতে পার। কাজটি তো

অবশ্যই ভালো, তবে তাড়াহুড়ো করার কী আছে, পরে করলেই বা কী... ঠিক আছে, তাহলে আজকের জন্য রেখে দাও, আগামীকাল করে নিও।'

মনে রাখবেন, এ ষড়যন্ত্রও খুবই সূক্ষ্ম। একেও তছনছ করে দিতে হবে। কারণ, নেককাজ এভাবে পিছিয়ে গেলে সামনে আসার সুযোগ তার আর নাও হতে পারে। সেই কথিত 'আগামীকাল' তোমার জীবনে নাও আসতে পারে। কিংবা এলেও নেক কাজের ভাগ্যে (!) সেটা নাও জুটতে পারে। যেমন পান করার সময় অন্তরে এ খেয়াল আসলো যে, বসে পান করা সুন্নাত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বসে যাবে। কিংবা খাবার খাওয়ার সময় মনে হলো যে, শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে নিবে। এ রকম ছোট-খাটো আমলকে ছোট মনে করবে না। এ জযবা সব সময় জাগরূক রাখবে। আমি এ জযবার কারণে 'আছান নেকিয়াঁ' নামক একটি ছোট্ট বই লিখেছিলাম। বইটিতে সেসব নেক আমলের আলোচনা করেছি, যেগুলো দৃশ্যত ছোট ও সহজ, অথচ সাওয়াব অনেক বেশি। প্রত্যেকে বইটি দেখার এবং আমল করার চেষ্টা করবেন।

ছোট গুনাহকে ছোট মনে করা

কোনো নেক কাজকে যেমন ছোট মনে করা অনুচিত, অনুরূপভাবে কোনো গুনাহকেও ছোট মনে করা উচিত নয়। গুনাহকে ছোট মনে করাটা শয়তানের ধোঁকা। যেমন কোনো গুনাহ করার জন্য মন আকুপাকু করলো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তা বর্জন করবে। অন্যথায় শয়তান এ বলে ধোঁকা দিবে যে, এর চেয়ে কত বড় গুনাহও তো তুমি করেছ, এটা তো একটা মামুলি গুনাহ। এটা করলে কোন কিয়ামতই বা ঘটবে ইত্যাদি। শয়তানের এ জাতীয় ধোঁকায় যেন ফেঁসে যেতে না হয়, তাই ছোট-বড় সকল গুনাহর প্রতিই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

ছোট গুনাহ এবং বড় গুনাহ

গুনাহ দু' প্রকার। সগীরা গুনাহ এবং কবীরা গুনাহ। এর অর্থ এটা নয় যে, সগীরা গুনাহ যেহেতু ছোট্ট, তাই তা করা যাবে। বরং গুনাহ তো গুনাহই। অনেকে শুধু এটাই দেখে যে, সগীরা গুনাহ কোনটি এবং বড় গুনাহ কোনটি। উদ্দেশ্য হলো, ছোট গুনাহ হলে করবে এবং বড় গুনাহ হলে ছাড়বে।

এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন! তিনি বলেছেন–

'আগুনের জ্বলন্ত কয়লা এবং লেলিহান শিখার মতোই সগীরা গুনাহ এবং কবীরা গুনাহ। একটি জ্বলন্ত কয়লা যেমনিভাবে আলমারির সব কাপড়কে জ্বালিয়ে দিতে পারে, তেমনিভাবে একটি সগীরা গুনাহও অনেক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। আগুনের কয়লাকে মানুষ যেমনিভাবে আদর করে আলমারিতে

রাখে না, তেমনিভাবে সগীরা গুনাহও করা যাবে না। মনে রাখবেন, আগুন তো আগুনই এবং গুনাহ্ তো গুনাহই। কিংবা একটি সাপের বাচ্চা এবং একটি বড় সাপ যেমনিভাবে দংশন করে বিষ ঢেলে দিতে পারে, তেমনিভাবে সগীরা কিংবা কবীরা উভয়টার মাধ্যমেই আল্লাহর নাফরমানী হয়।'

এ কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেছেন, কেউ যদি সগীরা গুনাহকে 'সগীরা' তথা ছোট ভেবে সেই গুনাহটি করে, তাহলে সেটিই কবীরা গুনাহ হয়ে গেলো।

গুনাহ গুনাহকে টানে

গুনাহর অর্থ হলো, আল্লাহর নাফরমানী। আর আল্লাহর একটি মাত্র নাফরমানী– চাই ছোট কিংবা বড়– দোযখে নেয়ার জন্য যথেষ্ট। তাছাড়া গুনাহ গুনাহকে টানে। সগীরা গুনাহ কবীরা গুনাহর জন্ম দেয়। এক গুনাহ্ শত গুনাহকে টেনে আনে। তাই যে কোনো গুনাহ থেকেই বেঁচে থাকা জরুরি।

তৃতীয় নসীহত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয় নসীহতটি করেছেন এভাবে– 'অপর ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার সময় হাসি মুখে কথা বলবে, হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করবে। কেননা, এটাও নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত।'

অপর হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

'মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে হাসি মুখে মিলিত হওয়াও সদকা। মানুষ এ কারণেও সাওয়াবের অধিকারী হয়।'

হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বিশিষ্ট সাহাবী। যাঁকে বলা হয়ে থাকে يُوْسُفُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ অর্থাৎ– এই উম্মতের ইউসুফ। কারণ, তিনি খুব সুদর্শন চেহারার অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেছেন–

'আমি যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তাঁকে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট চেয়েছি। যতবার তাঁর দিকে তাকিয়েছি, ততবার তিনি মুচকি হেসেছেন। একবারের জন্যও আমার মনে নেই যে, তাঁর চেহারায় হাসির আভা দেখা যায়নি। একটা অপার্থিব মুচকি হাসি তার চেহারায় খেলা করত।'

কেউ কেউ মনে করে, মানুষ যখন দ্বীনদার হবে, তখন তার চেহারা হবে বিমর্ষ ও বিষণ্ণ। একঘেয়ে একটানা একটা ময়লামাখা জীবন সে কাটাবে। এটাকে তারা দ্বীনের অংশও মনে করে। এসব কথা তারা কোত্থেকে আবিষ্কার করেছে,

আল্লাহই ভালো জানেন। অথচ এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাঁর চেহারাতে তো একটা অপূর্ব দীপ্তি সব সময়ই ঝলমল করতো, মুচকি হাসি খেলা করতো। আমাদের হযরত (রহ.) বলতেন–

'অনেকে সম্পদের কৃপণ, আবার অনেকে হয় হাসির কৃপণ। তার চেহারা কখনও হাসিমাখা থাকে না। অথচ এটা কত সহজ নেক আমল। কোনো মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে হাসির একটু ঝলক দেখাবে, এতে তার অন্তরও স্নিগ্ধ হয়ে ওঠবে। আর তুমি তার অন্তরকে খুশি করতে পারলে আমলনামায় নেকী পেয়ে যাবে তথা সদকার সাওয়াব পাবে।'

চতুর্থ নসীহত

চতুর্থ নসীহত হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'তোমার জামার নিচে পায়জামা, লুঙ্গি, সেলোয়ার যাই হোক না কেন, তা 'নিসফেসাক্ব' তথা অর্ধনালা পর্যন্ত রাখবে। যদি এতটুকু না পার, তাহলে টাখনু পর্যন্ত রাখবে। টাখনুর নিচে যেন না যায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। কেননা, টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা অহংকারেরই অংশ।'

হাদীসের এ অংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলেননি যে, অহংকারের আশঙ্কা থাকলে কাপড় টাখনুর নিচে নেয়া যাবে আর আশঙ্কা না থাকলে নেয়া যাবে। বরং তিনি বলেছেন, টাখনুর নিচে পরিধান করবে না, কারণ এটাও অহংকার। সুতরাং বুঝা গেলো, সর্বাবস্থায় টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম। কেউ কেউ বলে থাকে, আমাদের মনে অহংকার নেই, আমরা ফ্যাশন হিসাবে টাখনুর নিচে কাপড় পরি। তাদের এ ধরনের উক্তি বিস্ময়করই বটে। অন্যথায় এ পৃথিবীর বুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিনয়ী আর কে হতে পারে। তিনি জীবনে কখনও টাখনুর নিচে কাপড় পরেননি। অহংকারমুক্ত থাকলে যদি টাখনুর নিচে পরার অনুমতি থাকত, তাহলে জীবনে একবার হলেও তিনি করে দেখাতেন।

পঞ্চম নসীহত

পঞ্চম নসীহত হিসাব তিনি বলেছেন– 'কেউ তোমাকে মন্দ বললে কিংবা এখন কোনো দোষের কথা বললে যা বাস্তবেই তোমার মাঝে আছে, তাহলে এর প্রতিশোধ গিয়ে তার এমন কোনো দোষ প্রকাশ করে দিও না, যার কথা তোমার জানা আছে।'

অর্থাৎ– গালির জবাবে গালি দিও না। মন্দ বাক্যের পরিবর্তে মন্দ বাক্য বলো না। কারণ, তার এ গালির কুফল তোমাকে ভোগ করতে হবে না; বরং ভোগ করতে হবে তাকেই। তুমি যদি এতে সবর কর, তাহলে আল্লাহর পক্ষ উত্তম

প্রতিদান পাবে। আর সবর না করে যদি তুমি প্রতিশোধ নিয়ে নাও, তাহলে এতে তোমার কোনোই লাভ নেই। যেমন– এক ব্যক্তি তোমাকে 'বেকুফ' বললো, এর পরিবর্তে তুমিও যদি তাকে 'বেকুফ' বলো, তাহলে বলো, তোমার কী ফায়দা হবে? কিন্তু যদি সবর করতে পার, তাহলে তোমার কী ফায়দা হবে তা কুরআনের ভাষাতেই শোনো–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ– 'সবরকারীদের অগণিত সাওয়াব আল্লাহ তাআলা দান করেন।'

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ

অর্থাৎ– 'যে সবর করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয় এটা বড় সাহসিকতার কাজ।'

(সূরা শুরা : ৪৩)

আরো ইরশাদ করেছেন–

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ

وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ 'যারা তোমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করবে, জবাবে তুমি তাই বলবে, যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবে, তোমার সঙ্গে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গিয়েছে। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।' (সূরা হা-মীম-সিজদা : ৩৫–৩৬)

আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি অন্যকে ক্ষমা করে, আমি তাকে সেই দিন ক্ষমা করবো, যে দিন ক্ষমার প্রয়োজন তার সবচেয়ে বেশি থাকবে। আর স্পষ্ট কথা হলো, সে দিনটি হলো আখেরাতের দিন।

এসবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নসীহত। আমরা নিজেদের জীবনকে যদি এসব উপদেশ দ্বারা সমৃদ্ধ করতে পারি, তাহলে যাবতীয় ঝগড়া-ফ্যাসাদ এমনিতেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, শত্রুতা মিটে যাবে এবং ফিতনা দূর হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এসব উপদেশের ওপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

"এটা সত্য যে, আমরা আজ জাতি হিসাবে পতনের দিকে ধাবমান। আবার এটাও বাস্তব যে, এ পতনের ভেতরও মুসলিম উম্মাহর মাঝে অনুভূত হচ্ছে নব জাগরণের সুর। সুতরাং হতাশা ও নিরাশার ক্লিষ্টতায় একেবারে নিথর হয়ে যাওয়া যেমন আমাদের জন্য উচিত নয়, তেমনি ইসলামী জাগরণের নিরেট কিছু স্লোগান-শিরোনাম দেখে আশায় বুঁদ হয়ে বসে থাকাও শোভনীয় নয়। বরং শঙ্কা ও আশা- এ আলো- আঁধারিতেই যেহেতু আমাদের বর্তমান অবস্থান, সেহেতু বিষয়টিকে এভাবেই দেখা উচিত।

প্রশ্ন হলো, ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সংগঠনগুলো এ নির্মম পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে কেন? জাগানিয়া আন্দোলন, সুশৃঙ্খল সংগঠন, অগনিত প্রচেষ্টা, সময় ও শক্তি ব্যয়ের অদম্য স্পৃহা কেন ব্যর্থ হচ্ছে? এটি এমন এক জিজ্ঞাসা, যা নিয়ে আজ মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যকেই ভাবা উচিত।"

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থান কোথায়?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ - اَمَّا بَعْدُ!

মুহতারাম সভাপতি জনাব ডা. যফর ইসহাক আনসারী ও সুপ্রিয় উপস্থিতি!

আমি পরম আনন্দিত যে, দেশের একটি শীর্ষ দ্বীনী গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানকর্তৃক আয়োজিত আজকের বুদ্ধিজীবী সমাজের সেমিনারে আমি একজন ছাত্র হিসেবে যোগদান করার সুযোগ নিতে যাচ্ছি। এ মহতি অনুষ্ঠানে কিছু বলার সৌভাগ্যও আল্লাহর বিরাট এক অনুগ্রহ। আজকের বিষয়বস্তু আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই মুহতারাম ডা. যফর আহমদ আনসারী আমার সম্পর্কে যা বলেছেন– এটা তাঁর সুধারণা ও ভালোবাসাপ্রসূত মন্তব্য। অন্যথায় এ ব্যাপারে শুধু এতটুকু আরয করবো, আল্লাহ যেন বাস্তবেই আমাকে এর যোগ্য বানিয়ে দেন।

মুসলিম উম্মাহর দু'টি বিপরীত দিক

আপনারা জানেন যে, আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, 'মুসলিম উম্মাহর অবস্থান কোথায়?' এটি একটি ব্যাপক বিষয়, যার রয়েছে অনেকগুলো দিক। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম উম্মাহর অবস্থান কোথায়? জীবনাচারের দিক থেকে তার বর্তমান পজিশন কী? চরিত্র ও শিষ্টাচারের দিক থেকে তার বর্তমান অবস্থান কোথায় ইত্যাদি। মোটকথা, আজকের বিষয়বস্তু মূলত একটি জিজ্ঞাসা। যে জিজ্ঞাসাটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যার প্রতিটি জিজ্ঞাসাই বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। এক-দু'টি সেমিনারে প্রতিটি জিজ্ঞাসার সমাধান সম্ভব নয়। তাই এর একটিমাত্র দিক নিয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো। তাহলো মুসলিম উম্মাহ বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ কোথায় অবস্থান করছে? বর্তমানের মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে যদি আমরা একটু ভাবি, তাহলে দেখতে পাবো, দু'টি বিপরীতমুখী দিক আমাদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে। একটি হলো, মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে ধ্বংস ও অবক্ষয়ের শিকার। পতনের বেলাভূমিতে তার বর্তমান অবস্থান। দ্বিতীয়ত, অপর

দিকে দেখা যায়, এ বেলাভূমিতেই উচ্চারিত হচ্ছে ইসলামী জাগরণের জয়গান। প্রথমটির ফলাফল হলো, ভয় ও শঙ্কা। আর দ্বিতীয়টির ফলাফল হলো, স্বপ্ন ও আশা। শঙ্কার বেলায়ও আমরা মাত্রাতিরিক্ত নেতিয়ে পড়ি। আশার ক্ষেত্রেও আমরা আকাশকুসুম স্বপ্নের প্রাসাদ নির্মাণ করি।

প্রকৃত সত্য

অধমের কথা হলো, প্রকৃত সত্য এতদুভয়ের মাঝামাঝি। এটা সত্য যে, আমরা আজ জাতি হিসাবে পতনোন্মুখ জাতি। আবার এটাও বাস্তব যে, এই পতনের ভেতরেও গোটা মুসলিম বিশ্বে নব জাগরণের সূর অনুভূত হচ্ছে। সুতরাং হতাশা ও নিরাশার ক্লিষ্টতায় একেবারে নিথর হয়ে যাওয়া যেমনিভাবে আমাদের জন্য উচিত নয়, তেমনিভাবে ইসলামী জাগরণের নিরেট কিছু শ্লোগান-শিরোনাম দেখে উদাসীনতার শিকার হওয়াও আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। বরং শঙ্কা এবং আশার আলো-আঁধারিতেই যেহেতু আমাদের বর্তমান অবস্থান, সেহেতু বিষয়টি সেভাবেই দেখা উচিত।

এ কারণেই 'মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থান কোথায়?' –শিরোনামের এ বিষয়বস্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সুবাদে স্বাভাবিকভাবে এ প্রশ্নও চলে আসে যে, মুসলিম উম্মাহর অবস্থান কোথায় হওয়া এবং কিভাবে হওয়া উচিত? আমি ব্যক্তিগতভাবে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণে যা বুঝি তাহলো অনেক বিষয়ে এবং জীবনের বহু অধ্যায়ে আমরা কেবল অধঃপতনের শিকারই নয়; বরং বাস্তব অর্থেই অধঃপতিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম উম্মাহর প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে এ অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে যে, আমাদেরকে মূলে দিকে ফিরে যাওয়া উচিত এবং ইসলামকে পৃথিবীর বুকে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এই অনুভূতিকেই বর্তমানে 'আস-সাহওয়াতুল ইসলামিয়া' বা ইসলামী জাগরণ নামে অভিহিত করা হয়।

ইসলাম থেকে দূরে অবস্থান এবং একটি উদাহরণ

কুদরতের বিস্ময়কর কারিশমা যে, মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক বাগডোর যাদের হাতে, তাদের অবস্থা দেখলে মনে হয়, ইসলাম থেকে দূরে অবস্থানের সীমা একেবারে শেষ পর্যায়ে। একটি ঘটনা– যার তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। ঘটনাটি যদি আমার নিজের সঙ্গে না ঘটতো, তাহলে হয়তো আমার নিকট বিশ্বাসযোগ্য হতো না। কিন্তু যেহেতু আমার সঙ্গেই ঘটনাটির সম্পর্ক, তাই বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

একবার একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে প্রসিদ্ধ এক মুসলিম রাষ্ট্রে গিয়েছিলাম। দলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আমরা তাঁকে এক কপি কুরআন মজীদ হাদিয়া দিবো। যথারীতি বিষয়টি প্রটোকলকে জানানো হয়। কিন্তু একদিন পরই আমাদেরকে জানানো হয় যে, রাষ্ট্র প্রধানকে

কুরআন মজীদ হাদিয়া দেয়া যাবে না। এর কারণ হিসাবে আমাদেরকে বলা হয়, এতে দেশের সংখ্যালঘুদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। সুতরাং কুরআন মজীদ হাদিয়া নেয়ার ব্যাপারে তিনি অপারগ। এর পরিবর্তে প্রয়োজনে অন্য কিছু হাদিয়া দেয়া যেতে পারে।

সরকারী ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ইসলামের আজ এ অবস্থা!

ইসলামী জাগরণের একটি দৃষ্টান্ত

এ উত্তর শুনে আমরা তো হতবাক। সন্ধ্যা বেলায় আমাদের মসজিদে গিয়ে নামায পড়ার সুযোগ হয়। দেখলাম, মসজিদ কানায় কানায় পূর্ণ। প্রবীণ নয়, বরং তরুণদের উপস্থিতিই বেশি। নামায শেষে তরুণরা মসজিদের এক দিকে বসে পড়ে এবং আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়ে যায়। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, এটা তাদের প্রতি দিনের আমল। নামায শেষে সকলে প্রতিদিন বসে এবং একটি কিতাব থেকে কিছু পড়া হয়। তারপর পঠিত বিষয়ের ওপর পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা হয়। আরো জানলাম, এই আমলটি শুধু এ মসজিদে নয়, বরং দেশের সকল মসজিদেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলে। অথচ এরা অধিকাংশই তরুণ-যুবক। প্রথাগত কোনো সংগঠন তাদের নেই। তবুও এমন মহৎ কাজ সুবিন্যস্তভাবেই তাদের মাঝে চলে আসছে।

মুসলিম বিশ্বের সারচিত্র

রাজনীতি ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বর্তমান মুসলিম বিশ্ব ইসলাম থেকে একেবারে পিছিয়ে আছে– উক্ত আলোচনা থেকে এ ধারণাটুকু নিশ্চয় আপনারা পেয়েছেন। অপর দিকে তরুণ প্রজন্ম ইসলামের প্রতি ধীরে-ধীরে ধাবিত হচ্ছে– এটাও নিশ্চয় অনুভব করেছেন। মোটকথা, মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে যে সারচিত্রটি ভেসে ওঠে, তাহলো, রাজনৈতিক অঙ্গনগুলো ইসলামের সঙ্গে করছে শত্রুতামূলক আচরণ কিংবা অন্তত ইসলাম তাদের কাছে অপ্রিয়, ইসলামের প্রতি তাদের কোনো আকর্ষণ নেই। পক্ষান্তরে একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মাঝে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মাঝে ইসলাম ক্রমান্বয়ে ভরসার কেন্দ্র হয়ে ওঠছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বাস্তবমুখী কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে ওঠছে। ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের সন্তোষজনক পদক্ষেপগুলো তরুণদের কাছে গৃহীত হচ্ছে।

ইসলামের নামে জীবনবাজি

এ পথে চলছে যথেষ্ট সংখ্যক ত্যাগ ও কুরবানী। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ইসলাম বাস্তবায়ন করার যেসব আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে– এ থেকে অনুমিত হয়,

ইসলামের জন্য জান-মালের কুরবানীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বাস্তবতা হলো, এ দিকটি আমাদের জন্য গর্বযোগ্য। মিসর, আলজেরিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রে ত্যাগের যে নজীর পাওয়া যাচ্ছে এবং ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে অনন্য কুরবানী উপস্থাপিত হচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে উম্মতের জন্য গর্বের বিষয়। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আজও ঈমানের বিচ্ছুরণ আল্লাহর ফযলে মুসলমানদের অন্তরে বিদ্যমান রয়েছে।

আন্দোলনগুলো ব্যর্থ কেন?

কিন্তু এতসব প্রচেষ্টা ও তৎপরতা সত্ত্বেও একটি বিস্ময়কর দৃশ্য আমরা দেখতে পাই যে, কোনো আন্দোলনই বর্তমানে সফলতার শীর্ষ পর্যায়ে পৌছুতে পারছে না। মাঝপথে এসে তাদের কার্যক্রম নিথর হয়ে যাচ্ছে কিংবা অজানা কোনো কারণে স্থবির হয়ে পড়ছে কিংবা ষড়যন্ত্রের কালো হাত তাদের টুটি চেপে ধরছে। ফলে এসব আন্দোলন আশানুরূপ কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারছে না।

প্রশ্ন হলো, আন্দোলনগুলো কেন এ নির্মম পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে? জাগানিয়া আন্দোলন, ত্যাগ সংগঠন, অগণিত প্রচেষ্টা, সময় ও শক্তি ব্যয়ের অদম্য স্পৃহা কেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে?

এটি একটি জিজ্ঞাসা। প্রত্যেকেরই আজ এ নিয়ে ভাবা উচিত। একজন তালিবে ইলম হিসেবে আমি এ নিয়ে বারবার ভেবেছি। আর সে ভাবনাই আজ এ সেমিনারে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। আমাদের এত চেষ্টা-তৎপরতা সফলতার মুখ দেখছে না এবং কিভাবে আমরা এ পরিস্থিতি থেকে কেটে ওঠবো?

এ প্রসঙ্গে আমি এমন এক স্পর্শকাতর কথা আপনাদেরকে শোনাবো, যার সঠিক ব্যাখ্যা না করতে পারলে আমার আশঙ্কা হয় যে, ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হবে। এ আশঙ্কাকে মাড়িয়ে তবুও আমি এ বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, আমার মতে যেটি ব্যর্থতার মূল কারণ। দেল-দেমাগ ঠাণ্ডা রেখে এ বিষয়ে সকলেরই একটু চিন্তা করা উচিত বলে আমি মনে করি।

অমুসলিমদের ষড়যন্ত্রসমূহ

ইসলামী আন্দোলনগুলো সফল না হওয়ার পেছনে যে কারণটি আমরা সকলেই জানি, তাহলো, ইসলাম বিদ্বেষীদের অব্যাহত ষড়যন্ত্র। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। যেহেতু এটা সম্পূর্ণ জানা কথা। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি যা বিশ্বাস করি, তাহলো অনৈসলামিক শক্তিগুলো মুসলিম উম্মাহর ক্ষতিসাধনে ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হয় না, যতক্ষণ না মুসলিম উম্মাহর ভেতরেই ঘুণে ধরে যায়। উম্মাহর ভেতরে পঁচন ধরলেই বহিরাগত ষড়যন্ত্র সফল

হয়। তখনই শুরু হয় অধঃপতনের ধারা। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে এ পর্যন্ত ইসলাম কখনো ষড়যন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত ছিলো না। ষড়যন্ত্রের কণ্টকপূর্ণ পথ ধরে মুসলিম উম্মাহকে চলতে হবে। ষড়যন্ত্র আপনা আপনি বন্ধ হবে– এ ধরনের আশাবাদ আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়।

ষড়যন্ত্রগুলো সফল কেন?

ভাবনার বিষয় হলো, কী সেই ত্রুটি, কী সেই বিচ্যুতি, যার ছিদ্রপথে ষড়যন্ত্রগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটে এবং অবশেষে সফল হয়? ভাবতে হবে এজন্য– যেহেতু আমাদের বর্তমানের পতনোন্মুখ অবস্থা আলোচনায় যখন ওঠে, তখনই আমরা সকল দোষ 'ষড়যন্ত্র' নামক শব্দটির ঘাড়ে চাপিয়ে দেই। বলি, 'অমুকের ষড়যন্ত্রে কিংবা অমুকের রোপিত বীজের কারণেই আমরা অকেজো হয়ে পড়েছি।' এ ধরনের বক্তব্য ঝেড়ে আমরা দোষমুক্ত হওয়ার হাস্যকর কসরত করি। অথচ ভাবনার বিষয় হলো, আমাদের নিজেদের মাঝে কোন দোষটি বর্তমান? কোন অযোগ্যতার কারণে আমরা আজ লাঞ্ছিত-বঞ্চিত?

এ প্রসঙ্গে দু'টি মৌলিক বিষয়ের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, যেগুলো আমাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

ব্যক্তি গঠনে উদাসীনতা

তন্মধ্যে প্রথমটি হলো, ব্যক্তি গঠনে আমাদের অনাগ্রহ। আমি বোঝাতে চাচ্ছি, জ্ঞানী মাত্রই জানেন যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের শিক্ষা রয়েছে। ব্যক্তি, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র সকলের জন্যই ইসলাম এক অনুপম আদর্শ। এ সকল ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের স্বতন্ত্র নির্দেশনা। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে, ইসলামের বিধানগুলোতে যেমনিভাবে ব্যক্তির কথা রয়েছে, অনুরূপভাবে রয়েছে সমষ্টির কথাও। উভয়ের মাঝে রয়েছে ইসলামের বিধানাবলীর এক সোনালী যোগসূত্র। এ যোগসূত্রতা রক্ষা করলে জীবনের মাঝে আসবে ভারসাম্য। তখনই আমল হবে ইসলামের সকল বিধানের ওপর– একযোগে এবং একই সাথে। আর যদি তন্মধ্য থেকে যে কোনো একটি দিককে ছেড়ে দেয়া হয় অথবা অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেয়া হয়, কিংবা মোটেও গুরুত্ব দেয়া না হয়, তাহলে ইসলামের সৌন্দর্য ও সঠিক সামঞ্জস্য প্রতিভাত হবে না। ব্যক্তি ও সমষ্টির মাঝে ইসলামের ভারসাম্য আমরা নষ্ট করে ফেলেছি এবং এরই ফলে অগ্রাধিকারের বিন্যাসধারার মাঝে আমরা জট পাকিয়ে ফেলেছি।

সেক্যুলারিজম ও তার প্রতিরোধ

একটা সময় ছিলো, যখন মানুষ সেক্যুলারিজমের অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে ইসলামকে মসজিদ, মাদরাসা, নামায, রোযা ও নির্দিষ্ট কিছু ইবাদতের মধ্যে

সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিলো। এক কথায়, ইসলামকে প্রাইভেট জীবনের মাঝে আবদ্ধ করে দিয়েছিলো। আর এটাই হলো, সেক্যুলারিজমের দর্শন। অর্থাৎ ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়, রাজনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই; বরং ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ ধার্মিক হবে– এই ত্রুটিপূর্ণ দর্শন যখন সেক্যুলারিজম পেশ করে, তখন আমাদের সমাজে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইসলামী বুদ্ধিজীবি সামনে এগিয়ে আসেন এবং উক্ত মতবাদের খণ্ডন করেন। এ সুবাদে তারা বক্তব্য পেশ করেন। 'ইসলাম শুধু মানুষের প্রাইভেট জীবনের জন্যই নয়' বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধানাবলী। ইসলাম যেমনিভাবে ব্যক্তিজীবনের জন্য, তেমনিভাবে সমষ্টিগত জীবনের জন্যও।'

এ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধের নেতিবাচক প্রভাব

কিন্তু আমরা উক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধকে গ্রহণ করেছি অন্যভাবে। এর ফলে আমরা ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধানাবলীকে দূরে ঠেলে দিয়েছি কিংবা কমপক্ষে অগুরুত্বপূর্ণ ভেবে বসেছি। যেমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো যে, বলা হতো–

دَعْ مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلّٰهِ لِلّٰهِ

অর্থাৎ 'কাইজারের প্রাপ্য কাইজারকে দাও এবং আল্লাহর প্রাপ্য আল্লাহকে দাও।' এর অর্থ হলো, ধর্মকে রাজনীতির অঙ্গনে টেনে আনার প্রয়োজন নেই। এ দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র ধাক্কায় ধর্ম নিক্ষিপ্ত হয়েছে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে অনেক দূরে।

তাই উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিরোধকল্পে নতুন আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিলো। যেখানে রাজনৈতিক বিষয়ে ধর্মকে এমন জোরালোভাবে পেশ করা হলো, যার ফলে অনেকেই মনে করে বসলো– ইসলাম মানেই রাজনীতি।

রাজনীতি ইসলামের বহির্ভুত কিছু নয়; বরং এক্ষেত্রেও রয়েছে ইসলামের বিধানাবলী– একথা আপন জায়গায় অবশ্যই সঠিক। কিন্তু ইসলাম মানেই রাজনীতি কিংবা রাজনৈতিকভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের একমাত্র লক্ষ্য– এ ধরনের ধারণা মোটেও সঠিক নয়। এতে ইসলামের সঠিক মূল্যায়ন হয় না এবং ইসলামের বিধানাবলীর বিন্যাসধারা সুবিন্যস্ত থাকে না। এ দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নেয়ার অর্থ হলো, রাজনীতিকে ইসলামাইজেশন করার পরিবর্তে ইসলামকে রাজনীতিকরণ করে ফেলা এবং ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে ইসলামের যে অনুপম আদর্শ রয়েছে, তা থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে নেয়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবন

বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন আমাদের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের জন্যই সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর তেইশ বছরের

জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের জন্যই সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবন দু'ভাগে বিভক্ত। মক্কী জীবন এবং মাদানী জীবন। মক্কী জীবনের পরিধি ছিলো তের বছর আর মাদানী জীবনের ব্যাপ্তি ছিলো দশ বছর। তাঁর মক্কী জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এর মাঝে রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও যুদ্ধ-লড়াই ছিলো না। এমনকি চড়ের প্রতিউত্তরে চড়ও তিনি দেননি। বরং তখন বিধান ছিলো, কেউ অন্যায়ভাবে আঘাত করলে তুমি সহ্য করে যাও। ইরশাদ হয়েছে—

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ

'আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো, ধৈর্য তো আল্লাহরই জন্য।'

আঘাতের পরিবর্তে পাল্টা আঘাত করা যাবে না। এ ছিলো তখনকার বিধান। অথচ তখন মুসলমানরা দুর্বল থাকলেও এতটা দুর্বল তো ছিলো না যে, কেউ দুই হাত চালালে তার ওপর এক হাত চালানো যাবে না কিংবা কমপক্ষে তার হাত দমিয়ে দেয়া যাবে না। অন্তত এতটুকু শক্তি মুসলমানদের ছিলো। তবে তখনও বিধান ছিলো ধৈর্যধারণের, প্রতিশোধের বিধান তখনও দেয়া হয়নি।

মক্কায় হয়েছিলো ব্যক্তি গঠন

উক্ত বিধান তখন কেন দেয়া হয়েছিলো? কারণ, গোটা মক্কী জীবনের একটাই উদ্দেশ্য ছিলো, তাহলো এমন লোক তৈরি করা, যারা অনাগত ভবিষ্যতে ইসলামের বোঝা বহনে সক্ষম হবে। তের বছরের মক্কী জীবনের সারকথা ছিলো একটাই— জ্বলে-পুড়ে এরা মানুষ হবে, তাদের আমল ও চরিত্র পবিত্র হবে, তাদের আকীদা সুদৃঢ় হবে এবং এভাবে তারা পরিণত হবে সোনালী মানুষে। এদের দ্বারাই যুগ নির্মিত হবে, এদের সম্পর্ক থাকবে আল্লাহর সঙ্গে, তাঁর সামনে জবাবদিহিতার অনুভূতি এদের মাঝে সদা জাগরূক থাকবে।

মানবীয় উৎকর্ষ

দীর্ঘ তের বছর ব্যক্তি-গঠন প্রক্রিয়া পরিচালিত হওয়ার পর সূচনা হয় মাদানী জীবনের। সে সময়েই ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ঘটে এবং ইসলামের বিধান ও দণ্ডবিধিও প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটকথা, একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের জন্য যত কিছু প্রয়োজন, সবকিছুই পরিপূর্ণভাবে বিশ্বমঞ্চে উপস্থাপিত হয়। যেহেতু মানবীয় উৎকর্ষের ট্রেনিংকোর্স নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনেই সম্পন্ন হয়। তাই একটি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের অধিকারী এবং বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েও তাঁদের হৃদয়ের ধারে-কাছেও কখনও এ চিন্তা আসেনি যে, আমাদের উদ্দেশ্য হলো শুধু রাষ্ট্র গঠন কিংবা ক্ষমতা গ্রহণ। বরং ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে থেকেও

আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক তাঁদের মাঝে পূর্ণমাত্রায় ছিলো এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধ-জিহাদেও তাঁদের পূর্ণ তৎপরতা ছিলো। ইতিহাস সাক্ষী, এক অমুসলিম অফিসার সাহাবায়ে কেরামের এ সোনালী চিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন–

رُهْبَانٌ بِاللَّيْلِ وَرُكْبَانٌ بِالنَّهَارِ

অর্থাৎ– 'দিনের আলোতে তাঁরা ছিলেন সর্বোত্তম শাহসাওয়ার, বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যের ক্ষেত্রে অনন্য ও নামদার এবং রাতের নিশিথে ছিলেন অনুপম ইবাদতগুজার, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে ছিলেন তাঁরা খুবই চমৎকার।'

সারকথা, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দু'টি বৈশিষ্ট্য ছিলো। প্রথমটি হলো, সাধনা ও আমল। দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক। এ দু'টি বৈশিষ্ট্য একজন মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্য থেকে একটি উপেক্ষিত হলে ইসলামের সঠিক চিত্র প্রস্ফুটিত হবে না।

আমরা একদিকে ঝুঁকে পড়েছি

সাহাবায়ে কেরাম এক মুহূর্তের জন্য ভাবেননি যে, যেহেতু আমরা উচ্চ মর্যাদাসমৃদ্ধ, আমরা জিহাদ শুরু করেছি এবং বিশ্বময় ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছি; সুতরাং আমাদের জন্য তাহাজ্জুদের কী প্রয়োজন? আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি করার কী দরকার? আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির ঝক্কি-ঝামেলা আমরা কেন পোহাব? –এ ধরনের অর্থহীন চেতনা তাঁদের মাঝে মোটেও ছিলো না। বরং তাঁরা যথারীতি ইবাদত করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা-জিহাদও আঞ্জাম দিয়েছেন।

অথচ আমাদের অবস্থা হলো সাহাবা-চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেক্যুলারিজমের ওপর আঘাত করতে গিয়ে আমরা রাজনীতিকে ইসলামের অঙ্গ সাব্যস্ত করেছি বটে, তবে এর মাঝে আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আজ শুধুই রাজনীতিমুখী। এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আমল করতে গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির আলোকিত পথ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাহাজ্জুদের স্বাদ, ইবাদতের মজা, কান্নাকাটির সুমিষ্ট ধারা আমাদের নিকট আজ উপেক্ষিত। চিন্তাগতভাবে কিংবা অন্তত আমলীভাবে আমরা এ দিক থেকে একেবারে বঞ্চিত। ফলে ক্ষমতার রাজনীতিই আজ আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিগত ইবাদত আমাদের নিকট পুরোপুরি গুরুত্বহীন।

ব্যক্তি গঠনের চিন্তা থেকে আমরা উদাসীন

সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের ওপর অতিমাত্রায় জোর দিতে গিয়ে ব্যক্তি গঠনের চিন্তা আমরা ভুলে যাওয়ার অশুভ প্রতিক্রিয়াই বর্তমানের ইসলামী সংগঠনগুলোকে পঙ্গু

করে দিচ্ছে। অন্যথায় এসব আন্দোলন ও সংগঠনের কর্মীদের মাঝে ইখলাস ও জযবার তো কমতি নেই, তবে যেহেতু দ্বিতীয় বিষয়টি তাদের মাঝে নেই, তাই সফলতার দিগন্তে তারা আশার কোনো ঝিলিক দেখছে না।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু পাশাপাশি ব্যক্তি গঠনের প্রচেষ্টাও থাকতে হবে। কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করুন–

إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

'যদি তোমরা আল্লাহকে সহযোগিতা কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সহযোগিতা করবেন এবং তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করবেন।'

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নুসরত, বিজয় ও পৃথিবীর বুকে সুদৃঢ় অবস্থান মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যে জুটবে। কিন্তু এজন্য একটি শর্ত পূরণ করতে হবে। আর তাহলো, সর্বাবস্থায় তারা আল্লাহমুখী থাকতে হবে। আল্লাহর সাহায্য তখনই আসবে যখন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। এর মাঝে ঢিলেমিপনা চলে আসলে সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত তারা থাকবে না।

ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত ইসলামের শিক্ষাসমূহ যদি সঠিকভাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে সে ব্যক্তি পরিশীলিত জীবনের স্নিগ্ধতা পায়। এ ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাসমূহের মধ্যে যেমনিভাবে ইবাদতসমূহ রয়েছে, তেমনিভাবে চারিত্রিক পবিত্রতার বিষয়সমূহও রয়েছে। এ সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি গাফলতি করলে কিংবা ব্যক্তি গঠনের তরবিয়ত ত্রুটিপূর্ণ থাকলে, তার অনিবার্য কুফল হলো, তার সকল সংগ্রাম-প্রচেষ্টা অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

ব্যক্তিগত জীবনে নিজে পরিশীলিত না হয়ে যদি অন্যকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করে, তাহলে তার কথা ও কাজের কোনো সুফল আসতে পারে না। মানুষের মাঝে তার কোনো মূল্য থাকে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তিজীবনে পবিত্র হবে, যার চরিত্র অনুপম হবে, তার শুদ্ধিঅভিযানও সফল হবে। সে ব্যক্তি অন্যকে আত্মশুদ্ধির পথে আহ্বান করলে এর সুন্দর প্রভাব অবশ্যই পড়বে। বরং এমন ব্যক্তিই অপরের অন্তরে রেখাপাত করতে পারে। চারিত্রিক অশুদ্ধতা ও আমলী ত্রুটির পথ ধরেই সমূহ ফেতনা জনসমাজে আসে। এর ফলে ধন ও সম্মানের লোভ অন্তরে গেঁড়ে বসে। সামনে এগুতে গিয়ে তখনই মানুষ হোঁচট খায়। তখন ক্রেডিট অর্জনের স্বপ্ন মানুষকে গ্রাস করে ফেলে। এ জাতীয় মানুষের প্রতিটি কাজ হয় লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর ইখলাসশূন্য আমল নিয়ে মানুষ কখনও মনজিলে মাকসুদে পৌঁছুতে পারে না। এটাই স্বাভাবিক।

প্রথমে নিজেকে শুদ্ধ করার ফিকির কর

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের একটি আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের খবর নাও। (নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করার ফিকির কর) যদি তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত হও, তবে যারা পথচ্যুত হয়ে ভ্রষ্ট পথে চলেছে, তারা তোমাদেরকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। তিনি সে সময়ে জানিয়ে দিবেন যে, তোমরা দুনিয়াতে কী আমল করেছিলে।' (পারা ৭, রুকু ৪)

হাদীস শরীফে এসেছে, আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ আয়াতে নিজের ফিকির করার কথা বলা হচ্ছে, আরও বলা হচ্ছে– কেউ পথভ্রষ্ট হলে তোমাদের কিছু যায়-আসে না, তবে আমরা কি সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ছেড়ে দিবো? দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ আমরা কি করবো না?' প্রতিউত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'না, ব্যাপারটা এমন নয়, বরং তোমরা দাওয়াত-তাবলীগ করতে থাক।' তারপর তিনি বলেছেন–

اِذْ رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبِعًا وَدُنْيًا مُؤْثِرَةً وَاِعْجَابَ كُلِّ رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ

'যখন তুমি সমাজে চারটি জিনিসের ছড়াছড়ি দেখবে সে সময় তুমি নিজের ফিকির করবে। প্রথমত. অর্থের প্রতি লোভাতুর হয়ে যখন মানুষ তার সামনে নতজানু হয়ে যাবে। প্রতিটি কাজ অর্থের জন্যই করবে। দ্বিতীয়ত. মানুষ যখন প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হবে। তৃতীয়ত. প্রতিটি বিষয়ে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে এবং আখেরাত সম্পর্কে বেখবর হয়ে যাবে। চতুর্থত. সকল জ্ঞানী যখন নিজস্ব বুদ্ধিপ্রসূত রায়কে উপরে রাখতে গিয়ে অপরের রায়কে তুচ্ছ মনে করবে। নিজেকে রক্ষা করার ফিকিরই হবে তখন বুদ্ধিমানের কাজ। সাধারণ মানুষের ফিকির তখন প্রয়োজন নেই।

পথচ্যুত সমাজকে সোজা পথে আনার কর্মকৌশল

এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোনো কোনো আলেম বলেছেন, একটা সময় আসবে, যখন একজনের জন্য আরেকজনের উপদেশ কোনো কাজে আসবে না। ফলে সে সময় সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের দায়ভার থেকে মানুষ মুক্ত হয়ে যাবে। সে সময়ে মানুষের দায়িত্ব হবে, ঘরে বসে শুধু 'আল্লাহ-আল্লাহ' করা এবং নিজেকে শুদ্ধ করার চিন্তা করা। এছাড়া অন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই।

অপর একদল আলেম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হাদীসে সে সময়ের কথাবলা হয়েছে, যখন সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে। সমাজের প্রতিটি সদস্য যখন মোহের ভেতরে এতটা ডুবে যাবে যে, অপরের উপদেশ শোনার মানসিকতাই থাকবে না, সে সময়ে নিজের ফিকির কর এবং গণমানুষের ফিকির ছেড়ে দাও।

কিন্তু হাদীসটির অর্থ এ নয় যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ একেবারেই ছেড়ে দিবে। বরং এর মর্মার্থ হলো, তখন সমাজশুদ্ধির চেয়ে ব্যক্তি সংশোধনের গুরুত্ব দিতে হবে বেশি। কারণ, ব্যক্তির সমষ্টিকেই তো সমাজ বলে। যদি ব্যক্তি ঠিক না হয়, তাহলে সমাজ ঠিক হবে না। আর ব্যক্তি ঠিক হলে সমাজও আপনাআপনিই ঠিক হয়ে যাবে। সুতরাং পথচ্যুত সমাজকে সোজাপথে আনার সঠিক পন্থা হলো আত্মশুদ্ধির প্রতি জোর দেয়া।

ব্যক্তি সোজা পথে আসলে সমাজ সোজা পথে আসবে। এভাবে সমাজে পরিশুদ্ধ লোকের সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং ধীরে ধীরে সামাজিক নষ্টামী পুরোপুরি মিটে যাবে।

অতএব, হাদীসটি দাওয়াত-তাবলীগকে রহিত করছে না; বরং এ বিষয়ে একটি স্বয়ংক্রিয় কৌশলের পথ বলে দেয়া হচ্ছে।

ব্যর্থতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ

ইমাম মালিক (রহ.) বলেছিলেন–

لَيَصْلَحُ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ بِمَا صَلَحَ بِهٖ اَوَّلُهَا

'এ উম্মতের শেষ যামানার সংশোধন সেই পথেই হবে, যেই পথে প্রথম যামানার উম্মত সংশোধিত হয়েছে।'

এজন্য নতুন কোনো ফর্মূলার প্রয়োজন নেই। সাহাবায়ে কেরামের যুগে ব্যক্তিসংশোধনের পথ ধরেই সমাজ শুদ্ধ হয়েছে। আর আমরা ব্যক্তির কথা ভুলে বসেছি বিধায় বারবার ব্যর্থ হচ্ছি।

আরেকটি অন্যতম কারণ

আমাদের ব্যর্থতার আরেকটি অন্যতম কারণ হলো, ইসলামের সার্বজনীনতার ব্যাপারে আমাদের কোনো কর্মসূচি নেই। কিংবা থাকলেও সেগুলো যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি, একদিকে আমরা ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টি এতটাই গুরুত্ব দিচ্ছি যে, এটাই ইসলামের পরিচয় হিসাবে আমরা সমাজের সামনে উপস্থাপন করছি। অপর দিকে বর্তমান সমাজে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কর্মপন্থা কী হতে পারে– এ সম্পর্কে আমাদের কোনো সুধারণা ও সুবিন্যস্ত রোডম্যাপ নেই। কেউ একটু-আধটু প্ল্যান সাজালেও তা উল্লেখযোগ্য নয়। 'আল্লাহ না করুন' আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এ যুগে ইসলাম মানানসই নয় এবং ইসলামকে স্বাগতম জানানোর মতো মানসিকতা এ সমাজের মানুষের নেই, বরং ইসলাম তো সর্বকালের জন্য এবং সকল এলাকার জন্যই প্রযোজ্য। স্থান ও কালের সঙ্গে আল্লাহর এ দ্বীন সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং বর্তমান যুগের সঙ্গে ইসলাম খাপ খাবে না– এ জাতীয় ধারণা যার মাঝে আসবে, সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। তবে স্পষ্ট কথা হলো, বর্তমান যুগে ইসলামকে সুপ্রতিষ্টিত করতে হলে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অথচ এ বিষয়ে গভীর গবেষণা ও বাস্তবতা স্বীকার করার মতো অনুসন্ধিৎসা নেই বললেই চলে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মকৌশল যুগের চাহিদা হিসাবে পাল্টে যায়

আমরা ইসলামের জন্য কাজ করছি, চেষ্টা-সাধনা করছি এবং মানবজীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম চালাচ্ছি। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের মাঝে একটু ভুল ধারণা আছে। আমরা মনে করি, আমাদের কাছে 'ফতওয়ায়ে আলমগীরী' আছে, তাকে সামনে রাখবো এবং যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধান দেবো। এ জাতীয় নিষ্পাপ ধারণাকে সামনে রেখেই আমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন, কোনো 'মূলনীতি' চিরস্থায়ী হওয়া এবং সে মূলনীতির আলোকে যুগ-জিজ্ঞাসার সমাধান পেশ এক বিষয় নয়। মূলনীতিকে অক্ষত রেখে যুগ-পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে ফতওয়া তো সহজ বিষয় নয়।

ইসলাম আমাদের সামনে যেসব বিধান, শিক্ষা ও মূলনীতি পেশ করেছে, সেগুলো অবশ্যই সকল যুগের জন্যই উপযোগী। কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়ন করার কৌশল এবং যুগের চাহিদা সব সময় এক থাকে না। যেমন, মসজিদের কথাই ধরুন। মসজিদ নির্মাণ করার পদ্ধতি আগেকার যুগের জন্য এবং বর্তমান যুগের জন্য এক নয়। পূর্বে মসজিদ তৈরি হতো খেজুর পাতার ছাপড়া দ্বারা আর এখন মসজিদ তৈরি হয় ইট-বালু-সিমেন্ট দ্বারা। সুতরাং মসজিদ নির্মাণের মূলনীতি

যথাস্থানে অপরিবর্তনীয় থাকলেও নির্মাণকৌশলে এসেছে ভিন্নতা। অথবা মনে করুন, কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করো।

কিন্তু প্রথম যামানায় শক্তি-সঞ্চয় আর বর্তমান যুগের শক্তি সঞ্চয়ের পদ্ধতি এক নয়। সে সময়ের শক্তি-সঞ্চয় তরবারী ও কামানের মাধ্যমে হতো। আর বর্তমানের শক্তি সঞ্চয় বোমা, তোপ, বিমান ও আধুনিক সমরাস্ত্রের মাধ্যমে হয়। সুতরাং বোঝা গেলো, যুগের পরিবর্তনে পদ্ধতি ও কৌশলগত পরিবর্তনও আসবে, এটাই যুক্তিযুক্ত।

ইসলাম বাস্তবায়নের পথ ও পদ্ধতি

অনুরূপভাবে যখন ইসলামী বিধানগুলোকে বর্তমান সময়ে বাস্তবায়ন করা হবে, তখন সেক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী কিছু কৌশল-পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। দেখার বিষয় হলো, সেসব কৌশল ও পদ্ধতি কী হওয়া উচিত এবং ইসলামের অপরিবর্তনীয় ও স্বীকৃত মূলনীতিগুলোকে যুগের সঙ্গে কিভাবে খাপ খাওয়ানো হবে? এ ব্যাপারে আমরা আজ পর্যন্ত এমন কোনো প্ল্যান তৈরি করতে পারিনি, যাকে নির্ভরযোগ্য বলা যেতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে চেষ্টার কোনো ত্রুটি সমগ্র বিশ্বে যেমন নেই, তেমনি আমাদের দেশেও চলছে যথেষ্ট প্রয়াস। কিন্তু কোনো চেষ্টাকেই 'একমাত্র' কিংবা 'চূড়ান্ত' অভিধায় অভিহিত করা যাচ্ছে না। আর এরূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তৎপরতার অভাব যদি থাকে, তবে কোনো সংগঠন যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করতে পারলেও এক পর্যায়ে এসে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে কঠিন কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হবেই।

নতুন ব্যাখ্যা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। এরই মাঝে আমাদেরকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তাও সামনে আসবে। কিন্তু এখানে এসেই কোনো কোনো মহল ভুল দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হচ্ছে। ইসলামের নতুন ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তারা যুগের সবকিছুকেই 'জায়েয' আখ্যা দিচ্ছে। সুদ, জুয়া, বেপর্দাসহ চলমান যুগের অবৈধ বিষয়গুলোকে বৈধ সাব্যস্ত করার কসরত করছে।

তাদের এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, যা কিছু এ যুগে চলছে, সবই ঠিক। প্রয়োজন শুধু ইসলামীদের হাতে ক্ষমতা চলে আসা এবং পশ্চিমাদের আমদানী করা বিষয়গুলোর মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সরল অর্থ দাঁড়ায়– ইসলাম প্রতিষ্ঠার সমূহ প্রচেষ্টাই ব্যর্থ।

অতএব, ইসলামকে বর্তমান যুগে বাস্তবায়ন করতে হবে– এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামকে কাটছাঁট করে পাশ্চাত্য দর্শনের ধাঁচে ঢেলে সাজাতে হবে। বরং ইসলামকে বাস্তবায়ন করার সঠিক অর্থ হলো, ইসলামের মূলনীতিসমূহ ও বিধিবিধান সম্পূর্ণ অক্ষত রেখে এবং সেগুলোকে যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঢেলে সাজাতে হবে।

যেমন– ব্যবসা সংক্রান্ত ইসলামের মূলনীতি ও বিধি-বিধানসমূহ ফিকাহ শাস্ত্রের সকল গ্রন্থে সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ব্যবসা সম্পর্কে যেসব নিত্যনতুন মাসআলা সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোর সমাধান এসব গ্রন্থে স্পষ্টভাবে নেই। সে সবের সমাধান কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের সর্বস্বীকৃত মূলনীতিসমূহের আলোকে খুঁজে বের করতে হবে। অথচ এ ব্যাপারে আমাদের কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। এ বিষয়ে যত দিন পর্যন্ত আমরা বুৎপত্তি অর্জন করতে না পারবো এবং যুগ-চাহিদা মতে পূর্ণ সমাধান দিতে সক্ষম না হবো, তত দিন পর্যন্ত আমরা পরিপূর্ণভাবে সফল হবো না।

অনুরূপভাবে রাজনীতি সম্পর্কেও ইসলামের বিধি-বিধান ও মূলনীতি রয়েছে, কিন্তু আধুনিক যুগে সেগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, এ ব্যাপারে আমাদের ধারণা, গবেষণা ও কর্মকৌশল এখনও পর্যাপ্ত নয়। অসম্পূর্ণ ধারণা নিয়ে কাজ না চালানোর কারণেই আমরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জালে আটকে যাচ্ছি।

সারকথা

আমার দৃষ্টিতে উক্ত দু'টি মূল কারণই আমাদেরকে অনেক পিছিয়ে দিচ্ছে। আর উভয় কারণই মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক। প্রথম কারণ হলো, ব্যক্তি সংশোধনের ক্ষেত্রে আমাদের দৈন্যতা এবং ব্যক্তিগঠন প্রক্রিয়ার প্রতি আমাদের উদাসীনতা এবং এ দৈন্যতা ও উদাসীনতা নিয়েই সমাজে আমাদের অনুপ্রবেশ।

দ্বিতীয় কারণ হলো, যুগ-চাহিদার প্রেক্ষিতে ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে হলে যে গবেষণা, অনুসন্ধান ও বাস্তবসম্মত কর্মপদ্ধতি তৈরি করা জরুরি– তা যথেষ্ট না হওয়া। যদি এ দু'টি 'কারণ'কে পুরোপুরি অনুধাবন করে আমরা সমাধানের পথে অগ্রসর হই এবং এগুলোর তাগিদ যদি আমাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ যুগ আমাদেরকে স্বাগত জানাবে।

আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করে সে দিনটি দেখিয়ে দিন, যে দিন আমাদের আন্দোলনগুলো বাস্তব অর্থেই সফলতার পথ খুঁজে পাবে। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ